তাকলীদ-এর সুদৃঢ় রজ্জু

الحبل الوثيق في نصرة التقليد

মুফতী মাওলানা মোঃ গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী (ফুলতলী)

তাকলীদ-এর সুদৃঢ় রজ্জু

الحبل الوثيق في نصرة التقليد

মুফতী মাওলানা মোঃ গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী (ফুলতলী)

প্রকাশক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী
সাফওয়ান আহমদ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, জকিগন্জ, সিলেট।

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
যিলকদ ১৪৩৫ হিজরী

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ **সু**হেল মিয়া

মুদ্রণ
পূর্বদিক অফসেট প্রিন্টার্স
বি ব্লক (আন্ডারগ্রাউন্ড), হাজী নওয়াব আলী মার্কেট,
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

মূল্য : ১০০/- [একশত টাকা মাত্র]

প্রাপ্তিস্থান
ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
নোমানিয়া লাইব্রেরী, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
সাইমুন লাইব্রেরী, সোবহানীঘাট, সিলেট

স্পন্সর
আলহাজ্জ মোঃ জসিম উদ্দিন
পরিচালক, সিলসিলা ইসলামিক সোসাইটি ইউকে
ও ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার, কভেন্ট্রি, ইউকে

Taklider Sudriro Rojju by **Mufti Mawlana Md. Gias Uddin Chowdhury (Fultoli)**, Published by: Redwan Ahmed Chowdhury & Safwan Ahmed Chowdhury, Fultoli Saheb Bari, Zakigonj, Sylhet. Printed by: Purbodik Offset Printers, Subhanighat, Sylhet. 2nd Edition: September 2014, Price: 100.00 (One Hundred Taka Only).

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায় : কুফাবাসী ও ইমাম আবূ হানীফার প্রতি লা-মাযহাবীদের ক্ষোভ

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম বুখারী (র.)-এর সাথে গায়র মুকাল্লিদগণের মত পার্থক্য

ভূমিকা

نَحْمَدُه وَنُصَلِّي عَلي رسوله الكريم

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যিনি আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাভূক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। সালাত ও সালাম সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানব জাতির হেদায়াতের জন্য।

ইসলামী শরীআতের উৎস হচ্ছে চারটি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। শরীআতের কোন মাসআলায় কুরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বাণী না থাকলে কিংবা কোন মাসআলার সমাধানে ইজমা সংগঠিত না হলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ইজতিহাদ করে যে রায় প্রদান করবেন সাধারণ লোকদের তা মেনে নিয়ে এর উপর আমল করা আবশ্যক।

এখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন বলতে এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যিনি আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ বিষয়ে গভীর পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর, উসূলে ফিক্হ তথা মূলনীতি শাস্ত্রসমূহে গভীর জ্ঞানী। এ ধরনের ব্যক্তিগণ হলেন মুজতাহিদ। আর উপরোক্ত বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হবে সাধারণ লোক। মুজতাহিদের ইজতিহাদকৃত মাসআলাসমূহের উপর সাধারণ লোকের আমলকেই বলা হয় তাকলীদ।

সলফে সালিহীনের অনেকেই মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু মাত্র চারজন মুজতাহিদের ইজতিহাদ সব ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ হওয়ায় ফুকাহায়ে কিরাম চার ইমামের মাযহাবের উপর ঐকমত্য পোষণ করেন এবং এর উপর ইজমা সংঘটিত হয়। এখন মাযহাবের চার ইমামের যে কোন একজনের অনুসরণ করা প্রত্যেক অমুজতাহিদ মুসলমানের উপর ফরয।

কিন্তু কোন কোন লোক, বিশেষ করে কিছু মু'তাযিলা মতাবলম্বী মনে করেন যে, দলীল না জেনে কোন আলিমের ফতওয়া মেনে নেয়া সাধারণ লোকের জন্যও জায়িয নয়। এমনকি তারা মাযহাব অনুসারীদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা খতীব বাগদাদী (র.) বলেন-

وحكي عن بعض المعتزلة ، أنه قال : لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم ، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به وهذا غلط ، لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك ، إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ،

ويخالط الفقهاء المدة الطويلة ، ويتحقق طرق القياس ، ويعلم ما يصححه ويفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة ، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ، ولا سبيل لهم إليه

অর্থাৎ কোন কোন মু'তাযিলার মতে সাধারণ লোকের পক্ষেও দলীল না জেনে কোন আলিমের কথায় আমল করা বৈধ নয়। আসলে তা ঠিক নয়। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে এটি তখনই সম্ভব হবে, যখন তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফকীহগণের সান্নিধ্যে থেকে ফিক্হ অধ্যয়ন করবেন, কিয়াসের পথসমূহে পরিপক্ক হবেন, এর শুদ্ধি-অশুদ্ধি সম্পর্কে অবগত হবেন এবং দুই দলীলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ লোককে এরূপ কাজের দায়িত্ব দেয়া মানে অসাধ্য সাধনে বাধ্য করা।"

যারা মাযহাব মানে না তারা মুসলিম জাহানে গায়র মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী নামে পরিচিত। আমাদের দেশেও লা-মাযহাবীদের কিছু কিছু তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ দিন থেকে তাদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার অসারতা প্রমাণের জন্য কিছু লেখার তাকীদ অনুভব করলেও সময়ের অভাবে তা হয়ে উঠছিল না। অবশেষে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. তাহির আল-কাদরী সাহেবের উর্দু ভাষায় প্রদত্ত একটি ভাষণ শুনে এ বিষয়ে আরো উৎসাহিত হই। ইতোমধ্যে পাকিস্তানী লেখক আনোয়ার খুরশিদ সাহেবের উর্দু ভাষায় লিখিত **غير مقلدين: امام بخاري كي عدالت مين** নামক একখানা তথ্যনির্ভর কিতাব হস্তগত হয়। এ কিতাব থেকে তথ্য নিয়ে 'তাকলীদ এর সুদৃঢ় রজ্জু' (**الحبل الوثيق في نصرة التقليد**) নামে একখানা কিতাব পাঠকবৃন্দের খেদমতে উপস্থাপন করলাম।

উল্লেখ্য, এ গ্রন্থের বেশির ভাগ তথ্যই উপরোক্ত কিতাব থেকে গৃহীত। এছাড়া- আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরীর 'তুহফাতুল আহওয়াযী', ড. তাহির আল-কাদরীর 'ইমাম আবূ হানীফা', তোহফায়ে আহলে হাদীস, তরজুমান ইত্যাদি গ্রন্থ থেকেও সহযোগিতা নিয়েছি। বইখানা পাঠ করে মুসলিম সমাজ সামান্য উপকৃত হলেও এ শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

اللّٰهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

মা'আস সালাম

মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

ফুলতলী ছাহেব বাড়ী

জকিগন্জ, সিলেট

প্রথম অধ্যায়
তাকলীদ

তাকলীদের পরিচয়

তাকলীদের সংজ্ঞা উসূলবিদগণ এরূপভাবে দিয়েছেন-

العمل بقول امام مجتهد من غير مطالبة دليل

অর্থাৎ- তাকলীদ হচ্ছে দলীল তলব ছাড়া কোন মুজতাহিদ ইমামের উক্তির উপর আমল করা।

কেউ কেউ বলেন, প্রমাণবিহীন কারো কথা মেনে নেয়া এবং এরূপ উক্তিকে প্রমাণ মনে করা শিরক। এর উত্তরে বলা যাবে, তাকলীদের হাকীকত হচ্ছে মুজতাহিদকে বিধান প্রবর্তক হিসেবে আনুগত্যের যোগ্য মনে করে তার তাকলীদ করা যাবে না বরং শরঈ আইনের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়ার নাম তাকলীদ। যেমন কুরআন সুন্নাহর যে সকল আহকাম অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং যার অর্থ সুস্পষ্ট, ঐ সকল আহকামে তাকলীদের প্রশ্ন আসে না। তাকলীদের প্রশ্ন কেবল ঐ সকল আহকামে, যে গুলোর মর্ম সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট বা আপাত: বিরোধপূর্ণ। সুতরাং এখানে শিরকের কোন প্রশ্নই আসে না। ফলে তাকলীদ সম্পর্কে সমালোচনাকারীগণের বক্তব্য এখানে ধর্তব্য নয়।

তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

কুরআন, সুন্নাহ এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংঘটিত ইজমা ও কিয়াস-এ চারটি মূলনীতি হচ্ছে দীন ও শরীআতের যাবতীয় বিধি বিধানের মাপকাঠি। কিন্তু কুরআন সুন্নাহতে বর্ণিত আহকামসমূহের প্রত্যেকটি সমান নয়। কিছু কিছু আহকাম হচ্ছে স্পষ্ট ও বিরোধমুক্ত। যেমন নামায ফরয হওয়া, রোযা ফরয হওয়া, হজ্জ ফরয হওয়া, যিনা নিষিদ্ধ হওয়া, মদ খাওয়া ও চুরি করা নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর উপর আমলের জন্য কোন প্রকার চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে কিছু কিছু আহকাম হচ্ছে এমন যে, এগুলো সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত বা হাদীস অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত বা আপাত:দৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী: **وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** আলোচ্য আয়াতে **قُرُوءٍ** শব্দটি দুইটি অর্থে মুশতারাক। একটি হলো **حيض** (ঋতুস্রাব), অপরটি হলো **طهر** (পবিত্রতা)। সুতরাং এখানে শব্দটি কোন অর্থে গৃহীত হবে সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস:

مَنْ لم يترك المخابرة فليأذَن بِحَرب من الله ورسوله. (جامع الأصول في أحاديث الرسول)

অর্থাৎ যে মুখাবারা বা বর্গা ব্যবস্থা পরিহার করে না সে যেন আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধে নামার ঝুঁকি নেয়।

এ হাদীস থেকে আমভাবে বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু সকল বর্গাই নিষিদ্ধ নাকি এর বিশেষ কোন প্রকার নিষিদ্ধ তা এখানে সুস্পষ্ট নয়।

অন্য হাদীসে আছে- **مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . (إتحاف الخيرة المهرة)**

অর্থাৎ যে ইমামের পেছনে নামায পড়বে, ইমামের কিরাত তার জন্য যথেষ্ট হবে। অপরদিকে অন্য হাদীসে এসেছে-

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (إتحاف الخيرة المهرة)

অর্থাৎ যে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায শুদ্ধ হয়নি।

আলোচ্য হাদীসদ্বয় আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় কোন হাদীসের উপর আমল করা যাবে তা স্পষ্ট নয় এবং স্বাভাবিক ইলম দ্বারা তা বুঝাও সম্ভব নয়।

এ ধরণের জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে আমলের জন্য দুটি পথ। প্রথমত: নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে ফয়সালা করা। দ্বিতীয়ত: এ ব্যাপারে পূর্বসূরীগণের প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের আলোকে আমল করা। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পথই সাধারণ মানুষ ও অমুজতাহিদ আলিমের জন্য অপরিহার্য। তা না হলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর এরূপ মাসআলায় নির্দ্বিধায় কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করার নামই হচ্ছে তাকলীদ।

জটিল মাসআলায় সাধারণ লোকদের তাকলীদ ছাড়া কোন পথই নেই। তাদেরকে পূর্বসূরী প্রজ্ঞাশীল কোন মুজতাহিদকে অনুসরণ করতেই হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এরূপ তাকলীদের সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদে তাকলীদের দলীল

১। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং উলুল আমর এর আনুগত্য কর। (সূরা নিসা- ৫৯)

উক্ত আয়াতে أُولِي الْأَمْرِ বলতে কারা- এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম প্রায় সকলেই বলেছেন, এরা হলেন কুরআন সুন্নাহ'র ইলমের অধিকারী ফকীহ ও মুজতাহিদগণ।

২। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আছে-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ যখন তাদের কাছে শান্তি অথবা ভীতি সংক্রান্ত কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচারে লেগে যায়। অথচ যদি (তারা তা না করে) বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উলুল আমর এর কাছে ছেড়ে দিত, তাহলে ইস্তিম্বাতে পারদর্শী তথা সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারীগণ এর রহস্য উদঘাটন করতে পারতেন। (সূরা নিসা- ৮৩)

উক্ত আয়াত যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হলেও একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের শানে নুযুল খাস হলেও এর উপর আমল আম। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন জটিল বিষয়ে হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে বিজ্ঞ লোকদের প্রজ্ঞাশীল সিদ্ধান্তের অনুসরণ ও তাকলীদ করা আবশ্যক।

৩। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

–প্রত্যেক দল থেকে এক একটি ছোট দল ধর্মের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বেরিয়ে পড়ে না, যাতে তারা যখন তাদের কওমের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যেন তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবাহ- ১২২)

উক্ত আয়াতে ধর্মের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য একদল লোককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কওমের বাকী লোক যারা এ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করতে

পারেনি তাদেরকে ঐ ফকীহদের আনুগত্য বা তাকলীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪। আল্লাহ তাআলার বাণী- فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে ইলমদের কাছ থেকে জেনে নাও। (সূরা নহল- ৪৩, আম্বিয়া- ০৭)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সকলকে কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি ফতওয়া বের করার নির্দেশ না দিয়ে বরং কুরআন হাদীসের ইলমে পারদর্শী লোকদের কাছ থেকে অজ্ঞ লোকদের জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাকলীদের মূল কথাও হলো তাই।

হাদীস শরীফ থেকে তাকলীদের দলীল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসংখ্য হাদীস থেকে অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ আলিমের কাছে ফতওয়া তলব ও তদনুযায়ী আমল করার নির্দেশ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

০১। হাদীস শরীফে আছে-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَقَالَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

–হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- জানি না আমি আর কতদিন তোমাদের মধ্যে থাকব। সুতরাং তোমরা আমার পরবর্তীদের অনুসরণ করবে। একথা বলে তিনি আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমদ)

উক্ত হাদীসে 'ইকতিদা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ শরীআতের বিষয়সমূহে কেউ কারো অনুসরণ করা।

০২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

অর্থাৎ যে না জেনে ফতওয়া প্রদান করবে, এর পাপ ফতওয়াদাতার উপরই পতিত হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে ফতওয়ার দায়-দায়িত্ব ফতওয়াদাতার উপর চাপানো হয়েছে। কিন্তু তার ফতওয়া অনুযায়ী যারা আমল করেছেন তাদেরকে দোষারোপ করা হয়নি। আবার অনুসরণকারীদেরকে যাচাই বাছাই করে ফতওয়া গ্রহণের

নির্দেশও দেয়া হয়নি। এরূপ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফতওয়াদাতা ও আমলকারী উভয়কে সমানভাবে দোষারোপ করতেন। এতে বুঝা যায় একদল লোক কেবল তাকলীদ করবেন এবং তাদের তাকলীদ করা শুদ্ধ হবে।

০৩। কোন কোন সাহাবী নামাযের জামাতে দেরিতে এসে পেছনে দাঁড়ালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে প্রথমে এসে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর তাকীদ দিয়ে ইরশাদ করেন-

ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কিরামের তাকলীদ

সাহাবায়ে কিরামের যুগে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অভিজ্ঞ, ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের তাকলীদ প্রচলিত ছিল যা মওকুফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

০১। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশ:

عَن عكرمةَ عن بن عباس قال خطب عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأَتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِى فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَنِى لَهُ والِيًا وَقَاسِمًا.

অর্থাৎ হযরত ইকরামাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবিয়া নামক স্থানে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এক ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের যে কুরআন (ইলমে কিরাত) সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর কাছে যায়। ফরাইয সম্পর্কে জানতে চাইলে যেন হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা.)-এর কাছে যায়। ফিক্হ সম্পর্কে জানতে চাইলে মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর কাছে যায়। আর অর্থ সম্পর্কিত কিছু জানতে চাইলে আমার কাছে আসবে। কারণ আল্লাহ আমাকে সম্পদের ওয়ালী ও বন্টনকারী করেছেন।

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে যে বিষয়ে পারদর্শী সে বিষয়ে তার তাকলীদ করা যাবে।

২। ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْه.

অর্থাৎ হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন- তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে অন্য এক জনের কাছে মেয়াদী ঋণে পাওনাদার ছিল। এখন সে মেয়াদের পূর্বে পরিশোধের শর্তে কিছু ছাড় দিতে রাজী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তা অপছন্দ করলেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (মুসনাদে ইমাম মালিক)

উক্ত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নিজের কথার সমর্থনে কোন আয়াত বা মারফু হাদীস উল্লেখ করেননি। সুতরাং বুঝা যায় এটা তার নিজস্ব ইজতিহাদ। আর প্রশ্নকর্তা তাঁর ইজতিহাদী ফতওয়াকে দলীল-প্রমাণ তলব ছাড়াই মেনে নেন।

৩। হযরত সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) মসজিদে নামায আদায় করলে রুকু, সিজদা ও সালাত সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণরূপে করতেন। কিন্তু বাড়িতে নামায আদায় করলে তা দীর্ঘ করে আদায় করতেন। তাঁর ছেলে হযরত মুসআব (রা.) এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন-

يَا بُنَي ، إِنَّا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا. (إتحاف الخيرة المهرة ، مُصنف ابن أبي شيبة)

অর্থাৎ হে আমার বৎস! আমরা হলাম ইমাম, আমাদের অনুসরণ করা হয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় হযরত সা'দ (রা.)-এর নামায দীর্ঘ হলে তা দেখে লোকেরা মনে করবে এরূপ করা জরুরী এবং তারা তাঁকে দলীল জিজ্ঞেস না করেই আমল শুরু করে দিবে, যা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

৪। ইহরাম অবস্থায় হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর গায়ে রঙ্গীন কাপড় দেখে হযরত উমর (রা.) তাঁকে এরূপ কাপড় পরিধানের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত তালহা (রা.) জবাব দিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ রং-এ ঘ্রাণ নেই। আর ঘ্রাণ না থাকলে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করতে কোন বাঁধা নেই। জবাবে হযরত উমর (রা.) বলেন-

إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِى بِكُمُ النَّاسُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ : إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ فِى الإِحْرَامِ فَلاَ تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ. (موطأ الإمام مالك)

অর্থাৎ আপনারা হলেন ইমাম। লোকজন আপনাদের অনুসরণ করে। যদি কোন অজ্ঞ লোক এ পোশাক দেখে তা হলে বলবে, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) ইহরাম অবস্থায় রঙ্গীন কাপড় পরিধান করতেন। সুতরাং আপনারা এরূপ রঙ্গীন কাপড় পরিধান করবেন না।

০৫। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) কুফায় প্রেরণ করেন। তাদের সাথে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি দেন। চিঠির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপঃ

إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما. (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها)

-আমি তোমাদের কাছে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে আমির এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে শিক্ষক ও ওযীর হিসেবে পাঠালাম। তাঁরা দু'জনই হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট দুই বদরী সাহাবী। সুতরাং তাঁদের ইকতিদা করবে ও যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাকলীদ প্রচলিত ও স্বীকৃত ছিল। এমনকি স্বয়ং দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবীকে অনুসরণের ঘোষণা পর্যন্ত দিয়েছেন। যদি তাকলীদ বৈধ না হতো তাহলে উমর (রা.) এরূপ ঘোষণা দিতেন না। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগ থেকে তাবিঈ, তাবে তাবিঈনের যুগ ধরে সর্বযুগে তাকলীদ চলে আসছে। সুতরাং তাকলীদ শিরক হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না বরং তা জরুরী, বিশেষ করে গায়র মুজতাহিদ আলিমের জন্য তা অপরিহার্য।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু লোক নিজেদেরকে সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী মনে করে বলতে থাকে- শরীআতের মূলনীতি হল কুরআন ও হাদীস। এর বাইরে কোন কিছু মানা যাবে না। তারা কোন ইমামের অনুসরণ বা তাকলীদকে শির্ক বলতে শুরু করলো। তাদের কেউ কেউ আবার সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলে কেবল বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসের উপর আমল করতেই বেশি আগ্রহী। অথচ বাস্তবে দেখা যায় বুখারী শরীফের অনেক হাদীসের উপরও তাঁদের আমল নেই। ইমাম বুখারী (র.)-এর মতের সাথে তাদের মতামতের কোন মিল নেই। এমনকি পরবর্তী যুগের গায়র মুকল্লিদগণ তাদের পূর্বসূরীদের অনেকের মতামতকে অশালীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে পরিচয় দেন, অথচ হাদীসের কিতাব বলতে

তারা বুঝেন কেবল বুখারী ও কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম শরীফ। এছাড়া হাদীসের কিতাবকে তারা আমলে আনেন না। তাদের এ আচরণ স্ববিরোধী ও ভ্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিতাকলীদ

পূর্বের আলোচনায় তাকলীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উত্থাপিত একটি প্রশ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী। প্রশ্ন হল, শরীআতের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মুজতাহিদের নিজস্ব মতামত রয়েছে। যে কোন মাসআলায় যে কোন মুজতাহিদের অনুসরণ না করে সর্বক্ষেত্রে একজন মাত্র মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী কেন? এর জবাবে ব্যক্তিতাকলীদ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

কুরুনে সালাসাহ বা প্রথম তিন যুগে যে কোন মাসআলায় যে কোন মুজতাহিদের তাকলীদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুজতাহিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গত কারণে একই মাসআলায় বিভিন্ন মুজতাহিদের ভিন্ন ভিন্ন রায় পরিলক্ষিত হয়। তখন যুগের আলিম ও ফকীহগণ মুক্ত তাকলীদের পরিবর্তে ব্যক্তিতাকলীদের অপরিহার্যতার পক্ষে রায় প্রদান করেন। কারণ মুকাল্লিদগণ সব ক্ষেত্রে অবশ্যই সমান ধর্মপরায়ন নন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুবিধাবাদী হয়ে উঠতে পারেন। এর ফলে যে মুজতাহিদের যে মাসআলাটি তার পছন্দনীয় হবে তিনি সে মাসআলা গ্রহণ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ- শরীরের কোন অংশ হতে রক্ত বের হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উযু ভঙ্গ হবে, পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এতে উযু ভঙ্গ হবে না। এক্ষেত্রে যিনি বিনা উযুতে নামায আদায় করতে ইচ্ছুক তিনি বললেন- আমি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মুকাল্লিদ। আবার অন্য মাসআলায় কেউ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে উযু ভঙ্গ হবে কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উযু ভঙ্গ হবে না। তখন মুক্ত তাকলীদের অনুমতি থাকলে ঐ একই ব্যক্তি এ মাসআলায় বলতে পারে আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মুকাল্লিদ। তাহলে এরূপ অবস্থায়ও তার উযু লাগবে না। বিনা উযুতেই নামায আদায় করতে পারবেন। এ অবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ফুকাহায়ে কিরাম পরবর্তী যুগে যে কোন একজন ইমামের তাকলীদ বাধ্যতামূলক বলে ফতওয়া প্রদান করেন। সুতরাং এখন বিভিন্ন মাসআলায় সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ বৈধ নয়।

আগেই বলা হয়েছে, আহলে হাদীসগণ নিজেদেরকে স্বতন্ত্র গবেষক-মুজতাহিদ

মনে করে এবং সকল বিষয়ে কুরআন হাদীসের দলীল তলব করে আর তাকলীদকে শিরক বলে থাকে। তাদের একটি যুক্তি হলো তাকলীদ মানে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ। আর আল্লাহ তাআলা পূর্ব পুরুষদের অনুসরণকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার আনুগত্য কর, তখন তারা বলে- আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে মতবাদের উপর পেয়েছি তার আনুগত্য করব, যদিও তাদের পূর্ব পুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা হেদায়তপ্রাপ্তও ছিল না। (সূরা বাকারা-১৭০)

এ আয়াত দ্বারা গায়র মুকাল্লিদগণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করে। অথচ তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আয়াতটি মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। এটি আমল সংক্রান্ত তাকলীদ বিষয়ক নয়; বরং ঈমান বিষয়ক। এ আয়াতে মুশরিকদের বলা হয়েছে তারা যেন আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে ঈমান নাে।

চার মাযহাবের মধ্য থেকে যে কোন একটা অনুসরণ করা ওয়াজিব

চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটির অনুসরণ করা ওয়াজিব। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনে খালদুন ব্যক্তিতাকলীদের নিরংকুশ প্রসারের কার্যকারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন- অন্যান্য ইমামের মুকাল্লিদগণের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে বর্তমানে তাকলীদ চার ইমামের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর আলিমগণ চার ইমামের সাথে ভিন্নমত পোষণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কেননা প্রথমতঃ ইলমের সকল শাখায় পারিভাষিক জটিলতা ও ব্যাপকতাসহ বিভিন্ন কারণে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন দূরূহ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইজতিহাদের ধারালো অস্ত্র এমন সব অযোগ্য লোকদের দখলে চলে যাওয়ার আশংকা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান, যাদের ইলম ও ধার্মিকতার উপর কোন অবস্থাতেই আস্থা রাখা সম্ভব নয়। উপরোক্ত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলিমগণ ইজতিহাদের জটিল অঙ্গনে নিজেদের দীনতা ও অপারগতার অকপট স্বীকৃতি দিয়ে সর্বসাধারণকে চার ইমামের যে কোন একজনের তাকলীদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে বার বার ইমাম বদলের স্বাধীনতার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যাতে (শরীআত নিয়ে) মানুষ ছিনিমিনি খেলার সুযোগ না পায়। (আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা-৪৪৮)

মোটকথা, রাসূলের সান্নিধ্য ও নৈকট্যের কল্যাণে সাহাবা ও তাবিঈগণের পুণ্য যুগে পবিত্রতা ও ধার্মিকতা, তাকওয়া ও ইখলাসের অপ্রতিহত প্রভাব ছিলো সমাজ ও জীবনের সর্বত্র। প্রবৃত্তির উপর ঈমানের ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ ছিলো সুদৃঢ়। আল্লাহর ভয় ও পরকালের চিন্তা ছিলো প্রবল। ফলে তাদের পক্ষে শরীআত ও আহকামের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণের কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। এক কথায় দ্বীন ও শরীআত সম্পর্কে তাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অন্তরায় ছিলো না। তাই তখন উভয় প্রকার তাকলীদেরই স্বত:স্ফুর্ত প্রচলন ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লামা ইবনে খালদুন বর্ণিত আশংকা প্রকট হয়ে উঠার পরিপ্রেক্ষিতে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় আলিমগণ সর্বসম্মতিক্রমে মুক্ত তাকলীদের অনুমোদন রহিত করে ব্যক্তিতাকলীদকেই বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ ওয়ারিসে নবী হিসাবে তারা তখন এ মহা প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দ্বীন ও শরীআতের ক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হত তা আমাদের পক্ষে আজ অনুমান করাও সম্ভব নয়। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তাই লিখেছেন: প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের একক তাকলীদের সাধারণ প্রচলন ছিলো না। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের পর থেকেই মূলত এক মুজতাহিদ কেন্দ্রিক তাকলীদের ধারা শুরু হয়। ব্যক্তিতাকলীদের তুলনায় মুক্ততাকলীদের অনুসারী সংখ্যায় তখন খুবই কম ছিলো, সে যুগে এটাই ছিলো ওয়াজিব। (আল ইনসাফ ফি বায়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৯)

কোন কোন বন্ধু এই বলে প্রশ্ন তুলেছেন যে, সাহাবা তাবিঈ যুগের ঐচ্ছিক বিষয় পরবর্তীকালে এসে ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হতে পারে কি করে? শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) অনেক আগেই এ ধরনের স্থূল আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দিয়ে গেছেন। তাঁর ভাষায়- "এ প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য হলো, আহলে হক আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক যুগেই উম্মাহর এমন কতক লোকের উপস্থিতি একান্ত জরুরী যারা দলীল ও উৎসসমেত যাবতীয় মাসাইলের আলিম হবেন, যাতে সাধারণ লোকের পক্ষে মাসাইল জেনে আমল করা সম্ভব হয়। আর এও এক স্বীকৃত সত্য যে, ওয়াজিব বিষয়ের পূর্ব শর্তটিও একাধিক হলে যে কোন একটি গ্রহণ করাই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে একটি মাত্র পন্থা হলে সুনির্দিষ্টভাবে সেটাই ওয়াজিব হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সকল পূর্বসূরী হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না, অথচ আমাদের সময়ে তা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা সংকলন গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া ছাড়া হাদীস বর্ণনার অন্য কোন উপায় এখন নেই। তদ্রুপ তাদের মাতৃভাষা আরবী হওয়ার সুবাদে তাদেরকে

ভাষা ও ব্যাকরণ শিখতে হয়নি। অথচ আমাদের সময়ে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। কেননা আদি আরবদের সাথে আমাদের ব্যবধান দুস্তর। মোটকথা; এর (সময়ের ব্যবধানে ঐচ্ছিক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার) হাজারো নযীর রয়েছে। ব্যক্তিতাকলীদ বা এক মুজতাহিদ কেন্দ্রিক তাকলীদের বিষয়টিও একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। এটাও সময়ের ব্যবধানে ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক হতে পারে। (আল ইনসাফ ফি বায়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৯)

হাফিয ইবনে জারীর ও তার অনুগামীদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত আঞ্চলিক ভাষার যে কোনটি অনুসরণের অনুমতি ছিলো। ফলে সবাই পছন্দমতো যে কোন গোত্রীয় ভাষায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারতো। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এক বৈপ্লবিক ঘোষণার মাধ্যমে কুরাইশ বাদে আর ছয়টি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট অনুলিপিগুলো জ্বালিয়ে ফেলারও নির্দেশ জারি করেছিলেন। কেননা তিনি তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে উম্মাহ এক ভয়াবহ ফিতনায় জড়িয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে জারীর লিখেছেন- "উম্মাহকে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত ও হিফাযত তথা পঠন ও সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তবে পঠনের ক্ষেত্রে সাত আঞ্চলিক ভাষার অনুমতি ছিলো। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু কল্যাণকর দিক বিবেচনা করে উম্মাহ (সর্বসম্মতিক্রমে) ছয়টি আঞ্চলিক ভাষা বর্জন করে একটি মাত্র ভাষায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (তাফসীরে ইবনে জারীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯)

আহলে হাদীস কোন মাযহাব নয়

গায়র মুকাল্লিদগণের দাবি হল তারা আহলে হাদীস। যার অর্থ হচ্ছে হাদীসের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে তাদের এ কথাটি সঠিক নয়। মানুষকে হাদীসের অনুসারী না হয়ে সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে। আর হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীস হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম। এটি ব্যাপক। পক্ষান্তরে সুন্নাহ হচ্ছে তন্মধ্যে কেবল

অনুসরণযোগ্য বিষয়সমূহের নাম। উদাহরণ স্বরূপ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:

(ক) এমন কাজ যা অনুসরণ করা যাবে।

(খ) এমন কাজ যার অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। এটি কেবল তাঁর জন্যই খাস। যেমন- ইফতার ছাড়া এক টানা রোযা রাখা, একই সাথে ৪ জনের বেশি মহিলাকে বিবাহাধীনে রাখা ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় প্রকারের আমলগুলো হাদীস হলেও তা সুন্নাহ নয়। এগুলোর উপর আমল করাও জায়িয নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের অনুসরণের কথা না বলে বরং সুন্নাহর উপর আমল করতে বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. (موطأ الإمام مالك)

অর্থ : তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

تَرَكْتُ فيكُمْ أَمْرَيْنِ لنْ تَضِلُّوا ما تَمسَّكْتُمْ بهما : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رسولِهِ. (الموطأ مالك بن انس)

অর্থ : আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টি জিনিস হলো- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।

সুতরাং বলা যায় যারা নিজেদের আহলে হাদীস বলেন, তারা নিজেদের নাম নিয়েই বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

আহলে হাদীস নামধারীদের মতে মুকাল্লিদগণ হচ্ছেন আহলে ফিকহ ও আহলে রায়। আর তারা (গায়র মুকাল্লিদগণ) আহলে হাদীস। এ হিসেবে তাদেরই উচিত সকল মাসআলার উসূল বা মূলনীতি হাদীসের মধ্যে দেখানো। যেহেতু তারা হাদীস দিয়ে শরীআত পালন করতে চান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল তারা একদিকে আমাদের (মুকাল্লিদীনগণকে) আহলে ফিকহ বলেন, আবার সকল মাসআলায় আমাদের কাছে হাদীস দিয়ে দলীল তলব করেন। অথচ আমরা এমন দাবি করি না যে, সকল মাসআলার দলীল হাদীসের মধ্যে আছে। আমাদের জানা আবশ্যক যে, যারা নিজেদের আহলে হাদীস দাবি করেন তাদের জন্যই সকল মাসআলার সমাধানে হাদীস প্রদর্শন আবশ্যক। অথচ এটি তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গায়র মুকাল্লিদগণের জ্ঞানের স্বল্পতা

পাকিস্তানী লেখক আনোয়ার খুরশিদ সাহেব লা-মাযহাবী গায়র মুকাল্লিদদের জ্ঞানের স্বল্পতার দিকটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গায়র- মুকাল্লিদগণ নিজেদের আহলে হাদীস বলে দাবি করেন। এর অর্থ এই যে, হাদীসের জ্ঞান কেবল তাদেরই রয়েছে এবং তারাই হাদীসের উপর আমল করে থাকেন। মুকাল্লিদীন বা তাকলীদকারীগণের কাছে যেন কোন হাদীস নেই আর তারা হাদীসের উপর আমলও করেন না। তাদের এ ধারণা হচ্ছে নিজস্ব মতামত ও আত্মপ্রবঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে হাদীসশাস্ত্রের সাথে তাদের দূরসম্পর্কও নেই। তারা কেবল বিতর্কিত কিছু মাসআলাকে অবলম্বন করে নিজেদের মুহাদ্দিস ও হাদীসের ধারক বলে ভাবতে থাকেন। যদি তাদের নামাযের মাসআলাসমূহ বিশেষ করে নিত্য নতুন আবির্ভূত বিষয়সমূহের আহকাম সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তারা বগল ঝাঁকাতে লেগে যান এবং ঐ সমস্ত লেখকের বই অনুসন্ধানে লেগে যান যারা যে কাউকে মুশরিক বলতে তোয়াক্কা করেন না।

যদি তাদের হাদীস জ্ঞান পরীক্ষা করতে চান তাহলে তাদেরকে কতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই তাদের হাদীস চর্চার স্বরূপ অনুমান করতে পারবেন। উদাহরণ স্বরূপ: যদি তাদের প্রশ্ন করা হয় নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরিমা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, না নফল? তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কেউ নামায আরম্ভ করলে নামায ঠিক হবে কি না?

তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত তোলা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, না নফল?

হাত উত্তোলন না করে কেউ নামায আরম্ভ করে দিলে নামায হবে কি না? নামাযে হাত বাঁধা ফরয ওয়াজিব, সুন্নাত, না নফল? হাত না বাঁধলে নামায হবে কি না?

নামাযের শুরুতে ‘সানা’ পড়া ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত না নফল? ‘সানা’ না পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি না? রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, না নফল? যদি কেউ হাত উত্তোলন না করে, তবে তার নামায ঠিক হবে কি না?

যদি কেউ **سبحان ربي العظيم** এর স্থানে **سبحان ربي الاعلي** বলে অথবা তার বিপরীত পাঠ করে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে কি না?

ঠিক অনুরূপ যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে, উড়োজাহাজে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কি না?

যে সকল ক্যাসেটে কুরআন করীম রেকর্ড করা আছে, তা উযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয কি না?

ক্যাসেট থেকে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদাহ ওয়াজিব হবে কি না?
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না?
টেলিফোন অথবা ইন্টারনেটে কৃত বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না?
এসব মাসআলার জবাব তারা কুরআন শরীফের কোনো আয়াত অথবা সহীহ সরীহ মারফু হাদীস দ্বারা প্রদান করুক। কোন ইমামের উক্তি কিংবা নিজেরা কোন ইজতিহাদ করে দিলে চলবে না। কারণ তাদের মতে, কোন ইমামের দলীলবিহীন কথা মানার নাম তাকলীদ, যা শিরক। এছাড়া ইজতিহাদ ও কিয়াস করা শয়তানী কর্মকাণ্ড, যা কি না গুমরাহীর নামান্তর। (গায়র মুকাল্লিদীন: ইমাম বুখারী কি আদালত মে)
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, উপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া লা মাযহাবীদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপ আরো অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলোর জবাব তারা প্রদান করতে পারবে না। কারণ তাদের মতে যে কোন মাসআলায় সমাধান হয়তো হতে হবে কুরআনে কারীমের কোন আয়াত হতে, অথবা কোন সহীহ, সরীহ, মারফু’ হাদীস হতে। অথচ পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি কুরআন হাদীসে নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে তারা নির্বাক হতে বাধ্য। অন্যদিকে তাদের মতে দলীল প্রমাণ ছাড়া উম্মতের কোন কথা মেনে নেয়ার নাম হচ্ছে তাকলীদ। আর তাকলীদ হচ্ছে শির্‌ক এবং ইজতিহাদ ও কিয়াস হল শয়তানের কাজ- যা কিনা ভ্রষ্টতা (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বিশেষের ফতওয়া গ্রহণের সুযোগও তাদের নেই।
লা-মাযহাবী আহলে হাদীস নামধারীসহ সকলেই জানেন এবং মানেন যে, নামাযের সব কাজ ফরয নয়, অথবা সব কাজ ওয়াজিব বা সুন্নাত নয়। বরং কিছু কাজ ফরয, কিছু ওয়াজিব, কিছু সুন্নাত ও কিছু মুস্তাহাব । কিন্তু ইসলামী বিধানের এ মান তথা-ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদিও রাসূলের হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। নামাযের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। কিন্তু নামাযের কোন কাজটা ফরয, কোনটা ওয়াজিব এবং কোনটা সুন্নাত এর বর্ণনা হাদীসে সরাসরি নেই।
অথচ নামাযে কোন কাজটি ফরয, কোন কাজটি ওয়াজিব ও সুন্নাত তা নির্ধারণ হওয়ার ফলে এর হুকুমও জানা সহজ হয়েছে। যেমন ফরয ছুটলে তার হুকুম হল নামায পুণরায় পড়তে হবে। ওয়াজিব ছুটলে সিজদা সাহু করতে হবে। আর সুন্নাত ছুটলে নামায মাকরূহ হবে ও মুস্তাহাব ছুটলে সওয়াব কম হবে। হাদীস শরীফ ও সাহাবাদের আমলের উপর ইমামগণের ইজতিহাদের দ্বারা এগুলো সহজে বুঝার সুযোগ হয়েছে। ইসলামী বিধানের মান নির্ধারণ করে আমল করার জন্যও মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দলীল গ্রহণে সহীহ হাদীস

সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ

গায়র মুকল্লিদগণ আরেকটি বিষয় বেশি বেশি বলে থাকেন যে, দলীল গ্রহণের জন্য চাই সহীহ হাদীস। কোন গায়র সহীহ (হাসান, যঈফ স্তরের) হাদীস দিয়ে দলীল প্রদান করা যাবে না। কারণ তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সর্বক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল প্রদান করতে হয় তাহলে হাদীস সহীহ কিংবা দুর্বল হওয়ার বিষয়টিও মারফূ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। লা-মাযহাবীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, তারা কি সারা জীবন চেষ্টা করে কোন হাদীস অর্থাৎ রাসূলে পাক (সা.)-এর উক্তি কিংবা সাহাবায়ে কিরামের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন যে, কোন হাদীসটি সহীহ, আর কোনটি সহীহ নয়? নিশ্চয় তারা পারবেন না।

কোন হাদীস তো এমনি এমনি সহীহ বা যঈফ হয় না। হাদীসের মান নির্ধারিত হয় বর্ণনাকারীর অবস্থার দ্বারা। রাবী বা বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলে হাদীস সহীহ, বর্ণনাকারীর মধ্যে ত্রুটি থাকলে হাদীস যঈফ ইত্যাদি হয়ে থাকে। আর রাবীদের বর্ণনা হাদীসে নেই। এটি উসুলে হাদীসের আওতাধীন আলাদা একটি বিষয়। যার নাম হচ্ছে اسماء الرجال, এটি শুরু হয়েছে হাদীস সংকলনের সময় থেকে। তাবিঈগণের শেষ যুগে তথা ১৫০ হিজরীর দিকে এসে আইম্মায়ে হাদীস রাবীগণের তা'দীল ও তাজরীহ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন- আল-আ'মাশ (র.), শু'বা (র.) মা'মার (র.), হিশাম আদ-দাস্তাওয়াঈ (র.), আওযাঈ (র.) প্রমূখ। এরা সকলেই ১৫০ হিজরীর পরের লোক। তাঁদের লিখিত অমর গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করেই হাদীসের মানদণ্ড নিরূপন করা হয় বা হয়েছে। সহীহ, হাসান, গরীব, যঈফ, মুতাওয়াতির, মাশহুর ইত্যকার পরিভাষাও তাঁদের উদ্ভাবিত। লা-মাযহাবী আহলে হাদীস নামধারীগণ সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস মানেন না। অথচ হাদীস অবতরণের পথ রুদ্ধ হওয়ার পর অর্থাৎ সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের প্রায় দুই শত বছর পর যে পরিভাষা উদ্ভাবিত হয়েছে তা মানেন

এবং তা দিয়ে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের যে মানদণ্ড বিচার করেন তাও মানেন। এটা কি তাকলীদ নয়? নাকি ১২শ বছর আগের হাদীস বর্ণনাকারীগণের সাথে তাদের চলাফেরা, উঠাবসা হয়েছে যার ফলে তারা রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা নিজে যাচাই করেছেন? পাঠকগণ তাদের আত্মপ্রবঞ্চনার বিচার করবেন।

তারা সহীহ হাদীস বলতে কি বুঝাতে চান?

সহীহ শব্দের শাব্দিক অর্থ শুদ্ধ, যার বিপরীত অশুদ্ধ বা ভুল। কিন্তু মুহাদ্দিসীনগণের নিকট সহীহ একটি পরিভাষা। এটি হাদীসের সর্বোচ্চ স্তর। এছাড়াও হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা রয়েছে। যেমন হাসান, গরীব, যঈফ ইত্যাদি। কোন মুহাদ্দিসই সহীহ ছাড়া অন্যান্য স্তরকে বাতিল বলেননি। বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনের নিকট হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাপকাঠি রয়েছে। তাই একজন মুহাদ্দিসের মাপকাঠিতে কোন হাদীস সহীহ না হলেও অন্য মুহাদ্দিসের শর্তে তা সহীহ হতে পারে এবং উসুলে হাদীসের পরিভাষায় সহীহ নয় এমন সকল হাদীসই প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। যেমন সহীহ এর সকল শর্ত পূরণ না করলে কোন হাদীস হাসান হতে পারে। এটিও বিশুদ্ধ হাদীসের একটি প্রকার।

তাই কেবল সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল তলব করাও এক প্রকার ভুল। সিহাহ সিত্তার কোনো সংকলক কোনো হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.)-এর মাপকাঠিতে তা সহীহ এর পর্যায়ে পড়েনি বলে তিনি তাঁর কিতাবে তা সংকলন করেননি। তাই বলে এরূপ হাদীস আমলযোগ্য নয় বা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না- এমন মন্তব্য করা উসূলে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

প্রথমেই আমাদের জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে হাদীস বিশারদগণ হাদীসকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আর তা হলো সহীহ, হাসান, যঈফ ও মাওযূ।

লা-মাযহাবীদের কেউ কেউ যঈফ ও মাওযূকে একত্রিত করে ফেলেন। অথচ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত অনুযায়ী যে সকল হাদীসে সহীহ ও হাসান হওয়ার কোন একটি শর্তও পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলা হয়। কিন্তু কোন হাদীসকে মাওযু বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে বর্ণনাকারীর মিথ্যা বলা প্রমাণিত না হবে। সুতরাং যঈফ হাদীসকে মাওযূ বলা হাদীস বিশারদদের পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আর যঈফ হাদীসকে মিথ্যা, অনর্থক ইত্যাদি বলে তার উপর আমলকে হারাম মনে করা ইলমে হাদীসের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে।

বুখারী শরীফ দিয়ে দলীল গ্রহণ

মুকাল্লিদীন হানাফীগণ যখন নিজেদের অবস্থানের পক্ষে কোন হাদীস প্রদর্শন করেন তখন গায়র মুকাল্লিদীনগণ প্রশ্ন করেন যে, ঐ হাদীস কি বুখারী শরীফে আছে? অথচ তাদেরও একথা জানা আছে যে, সকল মাসআলার হাদীস বুখারী শরীফে নেই। এমতাবস্থায় বুখারী শরীফের হাদীস দেখানোর যিম্মা না নিয়ে আমাদের প্রশ্ন, লা-মাযহাবীগণ এরূপ কোনো আয়াত বা হাদীস কি দেখাতে পারবেন, যাতে লেখা আছে যে, হাদীস দ্বারা দলীল দিতে হলে তা কেবল বুখারী শরীফে থাকতে হবে?

দ্বিতীয়ত: তাদের নিজেদের আমলকৃত সকল মাসআলার দলীল তারা বুখারী শরীফে দেখাতে পারবেন কি? যদি পারেন তাহলে আমাদের কাছে হাদীস তলব করুন।

অবশ্য এক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, তাদের আমলকৃত অনেক মাসআলার দলীল বুখারী শরীফে নেই। উপরন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রে বুখারী শরীফে বর্ণিত অনেক হাদীসের উপর আমলই করে না। যার আলোচনা সামনে রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

''রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।'' কিন্তু কুরআন হাদীসের কোথাও কি একথা লিখিত আছে যে, **وَمَا آتَاكُمُ البخاري فَخُذُوهُ** ''বুখারী যা নিয়ে এসেছেন তোমরা কেবল তা-ই মেনে চল।'' যদি কুরআন হাদীসে এরূপ কোন কথা না থাকে তাহলে দলীল গ্রহণে শুধু বুখারী কিংবা বুখারী-মুসলিমের শর্তারোপ করা কিভাবে শুদ্ধ হয়?

তাছাড়া **اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح البخاري** এ কথা গায়র মুকাল্লিদগণও বিশ্বাস করেন। তাদের কাছে প্রশ্ন, কুরআন হাদীসে এরূপ কোন বর্ণনা কি আছে? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা এটা মানেন? উপরোক্ত মন্তব্যের উপর ইজমা তো পরবর্তী ইমামগণের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে এবং বুখারী শরীফ সংকলন সমাপ্ত হয় ২৩৩ হিজরীতে এবং পরবর্তীতে চার মাযহাবের উপর ইজমাও সংঘটিত হয়। তাহলে প্রশ্ন হল সকল আমল যদি বুখারী শরীফ দেখেই করতে হয় তা হলে বুখারী সংকলনের পূর্ববর্তী প্রায় সোয়া ২০০ বছর ইসলামী

শরীআতের উপর কিভাবে আমল করা হলো? আর তখন বুখারী শরীফ না থাকায় এর উপর যারা আমল করে যেতে পারেননি তাদের অবস্থা কি হবে?
প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর নিজের উক্তি অনুযায়ী তাঁর এক লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল। তন্মধ্যে বুখারী শরীফে তাকরার ছাড়া প্রায় ৪ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, বাকী ৯৬ হাজার সহীহ হাদীস কেবল বুখারী শরীফে সংকলিত না হওয়ায় কি আমলের অযোগ্য হয়ে গেল? ঐ হাদীসসমূহ অন্য কিতাবে সংকলিত হলে কি তার উপর আমল করা যাবে না?
বাস্তব কথা হলো, আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী ঐ সকল লোকদের নিজেদেরই বুখারী শরীফের উপর আমল নেই। আমলতো দূরের কথা, তাদের ইমাম বুখারী (র.)-এর উপর পুরোপুরি আস্থাও নেই। ইমাম বুখারী (র.) সংকলিত অনেক হাদীস, তাঁর অনেক ইজতিহাদ ও আমলের উপর তাদের আমল নেই। প্রমাণস্বরূপ আলোচ্য পুস্তকে অনেকগুলো মাসআলা দেখানো হয়েছে যাতে প্রমাণ হয় যে গায়র মুকাল্লিদগণ ইমাম বুখারী (র.)-এর আকীদা, আমল ও ইজতিহাদের সাথে একমত নয়।

‘সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব’ উক্তির সঠিক ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ কোনো কোনো ইমামের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি-
إذا صح الحديث فهو مذهبي অর্থাৎ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।
আহলে হাদীস, লামাযহাবী, সালাফীগণ উক্ত ‘সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব’ কথাটি দ্বারা বুঝাতে চান মাযহাবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সহীহ হাদীসের উপর আমল করে মাযহাব ত্যাগ করাই একান্ত কর্তব্য। এটি তাদের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

সহীহ হওয়া সত্ত্বেও সব আয়াত ও হাদীসের উপর আমল করা যায় না

ত্রিশ পারা কুরআন শরীফ সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা লিপিবদ্ধ। এতে কোন ঈমানদারের সন্দেহ করার উপায় নেই। এখন প্রশ্ন হলো, লা-মাযহাবীরা কুরআন শরীফের প্রত্যেক আয়াতের উপর আমল করতে পারবেন কি?
নমুনাস্বরূপ কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো-
১. এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। (সূরা নাহল, আয়াত-৬৭)
২. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল উভয়ের মধ্যে

রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। (সূরা বাকারা, আয়াত-২১৯)

৩. হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক সব ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৯০)

উপরে উল্লেখিত তিনটি আয়াতই সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা লিপিবদ্ধ। অথচ কেউ যদি উপরের প্রথমোক্ত দুটি আয়াতের উপর আমল করে তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমল করতে হবে তৃতীয় আয়াতের উপর। কুরআনে করীমে এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা কুরআনের আয়াত হওয়া সত্ত্বেও আমল করা যায় না। কারণ এগুলো রহিত হয়ে গেছে। এতে প্রমাণিত হলো যে কুরআন শরীফে অনেক আয়াত ও অনুরূপভাবে অসংখ্য হাদীস সহীহ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে এর উপর আমল করা যায় না।

ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য

শায়খ ইবনে তাইমিয়া যাকে লা-মাযহাবীরা ইমাম মনে করে এ প্রসঙ্গে তার একটি বক্তব্য শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব তার রচিত "শরীআত ও ত্বরীকত কা তালাযুম" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) "রফউল মালাম" নামক কিতাবে লিখেছেন যে, দশ কারণে ইমামগণ কোন হাদীস ছেড়ে দিতে পারেন। ১. ইমামের কাছে হাদীস পৌঁছেছে তবে তা প্রমাণিত হয়নি। ২. খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু পূর্বশর্ত ছিল যা তিনি এ হাদীসে পাননি। ৩. ঐ হাদীসের প্রতিদ্বন্দ্বী হাদীসও তার কাছে পৌঁছেছিল যার কারণে বাধ্য হয়ে তিনি ঐ হাদীসের ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এভাবে দশটি কারণ উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, এগুলো তো খুব স্পষ্ট কারণ। অনেক হাদীসের ক্ষেত্রে এটাও সম্ভব যে, ইমামের কাছে তা গ্রহণ না করার এমন কোন কারণ রয়েছে যে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। কারণ ইলমের ময়দান অনেক বিস্তৃত। আলিমদের সিনার মধ্যে এমন অনেক রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যে সম্পর্কে আমাদের কোন অবগতি নেই। আলিমগণ কখনও তার দাবির সপক্ষে দলীল পেশ করেন আবার কখনো করেন না। যদি করেন তাহলে তা আবার কখনো আমাদের কাছে পৌঁছে আবার কখনো পৌঁছে না। আর পৌঁছলেও তা কখনো আমাদের বুঝে আসে আবার কখনো বুঝে আসে না। হাদীস সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে তারা সবাই জানেন যে, চার ইমামের

নিকট অনেক সঠিক ও স্পষ্ট অর্থবহ হাদীস পৌঁছেছিল। কিন্তু অন্য কোন শক্তিশালী দলীলের কারণে তারা সেগুলোকে গ্রহণ করেননি।” (শরীআত ও ত্বরীকত কা তালাযুম, পৃষ্ঠা ৯৭)

উক্ত কিতাবে (শরীআত ও তরীকত কা তালাযুম) তিনি আরো লিখেছেন- বজলুল মজহুদের ৫খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠায় باب السارق يسرق مرارا -এর মধ্যে একাধিক বার চুরি করলে চোরকে হত্যা করা হবে এ মর্মের অনেকগুলো হাদীস আনা হয়েছে। পরে হযরত শায়খ ইবনুল কাইউম (র.) থেকে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইমাম আহমদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এসব হাদীস গ্রহণ করেননি কেন? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর এক হাদীসের উপর ভিত্তি করে, যার মধ্যে বলা হয়েছে, কোন মুসলমানকে শুধু তিন অবস্থায় কতল করা জায়িয আছে, আর তার মধ্যে চুরি করার কথা নেই। বজলুল মজহুদের মধ্যে এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আমার তো এখানে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, চোরকে হত্যা করা সংক্রান্ত হাদীস হযরত ইমাম আহমদ (র.)-এর কাছে পৌঁছেছে কিন্তু তিনি এর উপর আমল করেননি। পানি সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব দুই কুল্লা ওয়ালা। অথচ বি’রে বুদাআ’র হাদীসকে তিনি সঠিক বলেছেন। যেমন মুগনী কিতাবের ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। (শরীআত ও ত্বরীকত কা তালাযুম, পৃষ্ঠা ৯৬)

আল্লামা শায়খ হাবীব আহমদ আল-কায়রাওয়ানী (র.) বলেন- সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব এ বক্তব্যের বাস্তবতা বা মূল অর্থ হল- (ইমামগণ বলেন, আমাদের প্রদত্ত প্রতিটি (ফিকহী সমাধান বা মাসআলার) দলীল আমাদের কথা নয়, বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীই মূল দলীল।

অতএব, তোমরা এ কথা ধারণা কর না যে, আমাদের কথা স্বতন্ত্র দলীল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার বিপরীত আমাদের কোন কথা হলে আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দায়মুক্তি ঘোষনা করছি। তবে এ বাস্তবতা এটি আবশ্যক করে না যে, কোন ব্যক্তি যে কোন হাদীসকে সহীহ বলবে আর সেটিই ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মাযহাব হয়ে যাবে। (ইলাউস সুনান, আল্লামা শায়খ হাবীব আহমদ আল-কায়রাওয়ানী, দ্বিতীয় মুকাদ্দামাহ, পৃষ্ঠা-৬৪)

ইবনে আবিদীন শামী (র.) তাঁর রদ্দুল মুহতার কিতাবে ইমাম শা’রানী (র.) থেকে ইমামগণের উক্ত বাক্য (সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব) উল্লেখ করে বলেন- এটি কোন আলিমের কাছে অপ্রকাশ্য নয় যে, ইমামগণের এ নসীহত ঐ

সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা এ নসীহতের যোগ্য। অর্থাৎ যারা নুসুস তথা কুরআন ও হাদীসভাণ্ডারের উপর ব্যাপক গবেষণার সামর্থ রাখেন। মানসূখ বা রহিত হয়ে যাওয়া হাদীসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং যে হাদীসগুলো আমলযোগ্য তাও তাদের নখদর্পনে থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- এমন বহু হাদীস রয়েছে যা উলূমে হাদীসের শর্তানুযায়ী সহীহ; কিন্তু সে হাদীস রহিত হয়ে গেছে। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

কেবল সহীহ নয় বরং আমলযোগ্য হাদীসই গ্রহণীয়

ফাকীহুল ইরাক ইমাম ইবরাহীম নাখাঈ (র.) বলেন, আমি হাদীস শ্রবণ করি অতঃপর দেখি কোন হাদীস আমলযোগ্য আর কোন হাদীস আমলযোগ্য নয়। যেগুলো আমলযোগ্য সেগুলো আমি গ্রহণ করি। আর বাকীগুলো ছেড়ে দেই। (শরহু ইলালিত তিরমিযী , ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

ইমামুল মুজতাহিদীন ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ফিকহুল হাদীস বা হাদীসের ফিকহ অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না সে হাদীসভাণ্ডারের কিছু গ্রহণ করে ও কিছু ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ আমলযোগ্য হাদীসগুলো গ্রহণ করে ও যেগুলো আমলযোগ্য নয় সেগুলো ছেড়ে দেয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (র.) বলেন, যদি মালিক ইবনে আনাস ও লাইস ইবনে সা’আদ (রা.) না থাকত তাহলে আমি হালাক বা ধংস হয়ে যেতাম। কারণ আমি ধারণা করতাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই আমলযোগ্য। অপর বণর্নায় এসেছে, হাদীসের ইখতিলাফের কারণে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। (ইবনে রজব হাম্বলী, শরহু ইলালিত তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা; ইবনে আবি হাতিম, মুকাদ্দামাতুল জারহি ওয়াত তা’দীল, পৃষ্ঠা- ২২)

কাযী ইয়ায (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (র.)-এর কথাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (র.) বলেন, যদি মালিক ইবনে আনাস ও লাইস ইবনে সা‘আদ না থাকত তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (র.) এ কথা বললে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন কেন?

তিনি উত্তরে বলেন, আমি প্রচুর হাদীস সংকলন করেছিলাম। হাদীসের আধিক্য আমাকে দিশেহারা করে তোলে, তখন আমি উক্ত হাদীসগুলো ইমাম মালিক ও ইমাম লাইস (র.)-এর নিকট পেশ করি। তারা আমাকে বলেন তুমি এই এই হাদীস গ্রহণ কর এবং এই হাদীস ত্যাগ কর (তারতীবুল মাদারিক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪১৭)

লা-মাযহাবীদের জন্য ইমাম মালিক (র.)-এর একটি উপযুক্ত জবাব

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ইমাম মালিক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ইবনে উয়াইনার নিকট যুহুরী (র.) থেকে অনেক হাদীস রয়েছে সে হাদীসগুলো তো আপনার নিকট দেখি না।

উত্তরে ইমাম মালিক (র.) বলেন, যে সকল হাদীস আমি সংকলন করেছি তার সবই যদি আমি বর্ণনা করি তাহলে আমি মানুষদের পথভ্রষ্ট করে দিব। (খতীব বাগদাদী (র.) 'আল জামি'উ লি আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি' খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৯)

যে হাদীসের উপর ইমামদের আমল নেই তার হুকুম

ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' কিতাবে বলেন, যে হাদীস গ্রহন করা থেকে ইমামগণ বিরত থেকেছেন উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা জায়িয নেই, যদিও হাদীসটি সহীহ হয় না কেন। (ইমাম যাহাবী (র.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪০৪)

ইবনে রজব হাম্বলী (র.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী (র.) বলেন, হাদীসের ইমামগণ ঐ সকল সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করেছেন, যে হাদীসগুলো সাহাবাগণের নিকট ও পরবর্তী ইমামগণের নিকট আমলযোগ্য ছিল, অথবা তাদের কোন এক দলের নিকট আমলযোগ্য ছিল। এজন্যে ইমামগণ কোন হাদীসকে বর্জন করলে উক্ত হাদীসের উপর আমল করা জায়িয নেই। কেননা তারা উক্ত হাদীসকে এ কথা জেনেই বর্জন করেছেন যে, উক্ত হাদীসের উপর আমল করা হবে না। (**فضل علم السلف علي الخلف** পৃষ্ঠা-৯, সূত্রঃ আসারুল হাদীস, পৃষ্ঠা-৭৮)

হাদীসের উপর আমল করতে হলে কি জানতে হয়

হাদীসের উপর আমল করতে হলে কি জানতে হয় এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া সাহেব তদীয় 'শরীআত ও ত্বরীকত কা তালাযুম'' পুস্তকে একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- হাদীসের উপর আমল করার জন্য উসূলে হাদীস জানা থাকা জরুরী। নমুনাস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হল। এগুলো ছাড়াও হাফিয ইবনে হাজার (র.) যে কয়েকটি প্রকার জানা জরুরী বলেছেন তা হলোঃ ১. হাদীসে মাকলূব ২. হাদীসে মদ্বতারাব ৩. হাদীসে মুস্হাফ ৪. হাদীসে মুহাররাফ ৫. হাদীসে মারফু ৬. হাদীসে মাকতু ৭. হাদীসে

মুসনাদ ৮. হাদীস আল উলূউল মুতলাক ৯. হাদীসে আল উলূউন নাসাবী ১০. হাদীস আল মুয়াফাকা ১১. হাদীসে বদলে মুসাওয়াত ১২. হাদীসে মুসাফাহা ১৩. হাদীসে নুযুলে আকরান ১৪. হাদীসে মুদাব্বাজ ১৫. হাদীসে রিওয়ায়াতুল আকাবির আনিল আসাগির ১৬. হাদীসে আস'সাবিক ১৭. হাদীসে আল'লাহিক ১৮. হাদীসে মুসালসাল ১৯. হাদীসে মুত্তাফাক ২০. হাদীসে মুফতারাক ২১. হাদীসে মুতালাফ ২২. হাদীসে মুখতালাফ ২৩. হাদীসে মুতাশাবিহ।

হাদীস বুঝার জন্য এতটুকই যথেষ্ট নয় যে, হাদীসের অনুবাদ পড়ে মুহাদ্দিস হয়ে যাবে এবং হাদীস দ্বারা মাসআলা বের করা শুরু করে দিবে। হাফিয ইবনে হাজার (র.) তার "নুখবাতুল ফিক্‌র" নামক কিতাবে একথাও লিখেছেন যে, এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে এ বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। এর জন্য অনেক বড় কিতাবের প্রয়োজন। সুতরাং কোন হাদীসের কিতাবের অনুবাদ পড়ে নেয়া কিংবা কোন ফাযায়িলের কিতাব দেখে নেয়াই যথেষ্ট নয়। মুহাদ্দিস হওয়া অনেক কঠিন কাজ। তেমনিভাবে কুরআন পাকের অনুবাদ পড়ে নিজেকে কুরআন পাকের পণ্ডিত মনে করাও আহাম্মকী ও বোকামী। কুরআন বুঝার জন্য শুধু অনুবাদ পড়াই যথেষ্ট নয়। কুরআন বিষয়ক বিশদ ইল্‌ম হাসিল করার পূর্বে নিজেকে কুরআনের গবেষক মনে করলে মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়ে যেতে হয়।

আহলে হাদীসের জনৈক ব্যক্তির আমল ছিল, সে ইস্তিঞ্জা করার পর বিতির নামায পড়ত। কেউ তাকে প্রশ্ন করল, তুমি এটা কিসের নামায পড়? সে উত্তর দিল, হাদীসে আছে- **من استجمر فليوتر** অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা করবে তার বিতির পড়া উচিত।' অথচ হাদীসের অর্থ হল, যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা করবে তার জন্য বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা উচিত। এখানে সে বেজোড় সংখ্যা ঢিলার কথা বুঝতে না পেরে বে-জোড় রাকাত নামাযের কথা বুঝতে পেরেছে, তথা বিতিরের নামাযের অর্থ বুঝেছে।

তেমনিভাবে এক লোক তার কূপের পানি অন্য লোকের ক্ষেতের জন্য দিত না, কঠোরভাবে সে এতে বাঁধা দিতো। সে এর কারণ বলত হাদীসে আছে, **لايسقى احدكم مائه زرع غيره!** অর্থ : "কেউ যেন তার পানি অন্যের ক্ষেতে সেচন না করে"। অথচ হাদীসের উদ্দেশ্য হল, অন্তঃসত্ত্বা দাসী খরিদ করার পর যেন তার সাথে সহবাস না করে। হাদীসে পানি দ্বারা বীর্য বুঝানো হয়েছে, আর ক্ষেত দ্বারা মহিলার লজ্জাস্থানকে বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের আরো অনেক উপমা রয়েছে যা আল্লামা ইবনে জাওযী 'তালবীসে ইবলীস' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আবূ দাউদ শরীফে আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা.) কে বলল, আপনি এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেন যার কোন ভিত্তি কুরআনে নেই। একথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি কুরআনে কোথাও কি একথা পেয়েছো যে, প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এতগুলো ছাগল হলে এত যাকাত দিতে হবে, এতগুলো উট হলে এত যাকাত দিতে হবে? এসব কথা কুরআন পাকের কোথাও পেয়েছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, কুরআনে নেই তো এগুলো পেলে কিভাবে বা এর উপর আমল কর কিভাবে? তুমি এগুলো আমার থেকে শিখেছ আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখেছি। এমনিভাবে তিনি আরো মাসআলার কথা বললেন যেগুলোর বর্ণনা কুরআনে নেই। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন পাকের উপর আমল করার জন্য হাদীসের জ্ঞান থাকা অতীব জরুরী। আর কুরআন ও হাদীস বুঝার জন্য আবার ঐসব বিষয় জানা জরুরী যার বর্ণনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। (শরীআত ও ত্বরীকত কা তালাযুম, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০)।

সর্বক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণের ভ্রান্ত দাবি

লা-মাযহাবী আহলে হাদীস নামধারীরা সর্বক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণের দাবি করে থাকে। অথচ এ দাবিটি ভ্রান্ত। মুহাদ্দিসীনে কিরাম ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসকেও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের ইমামগণের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হলো।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (র.) তাঁর الاجوبة الفاصلة কিতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

و قد قال الامام احمد و غيره من الائمة: اذا روينا في الحلال والحرام شددنا واذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا. (كذا في الكفاية للخطيب البغدادي)

অনুবাদ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও অপর অনেকে বলেন, যখন আমরা হালাল ও হারাম বিষয়ে কোন বর্ণনা পেশ করি তখন (সনদের ক্ষেত্রে) কঠোরতা অবলম্বন করি। আর যখন ফযীলতের ক্ষেত্রে কোন বর্ণনা পেশ করি তখন উদারতা অবলম্বন করি। (এরূপই বর্ণিত হয়েছে খতীবে বাগদাদীর 'কিফায়াহ' গ্রন্থে)

একই দিনে জুম'আ ও আরাফা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস

افضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة.

অনুবাদ : উত্তম দিন হচ্ছে আরাফার দিন এবং যদি সেদিনের সাথে জুম'আর দিন একত্রিত হয় তবে তা সত্তরটি হজ্জের চেয়েও উত্তম।

হাদীসখানাকে কেউ কেউ যঈফ বলে থাকেন। মোল্লা আলী কারী (মৃত্যু-১০১৪হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের জবাবে বলেন,

فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من ارباب الكمال.

(الحظ الاوفر في الحج الاكبر)

অনুবাদ: সকল শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের নিকট ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। (আল হায্যুল আউফার)

মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওযূতে ঘাড় মাসেহ করা সম্পর্কে তার 'আল-মাওদুআত' কিতাবে লিখেন-

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ.

অনুবাদ: উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত হল, ফাযায়িলে আমালের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে। এ কারণে আমাদের আলিমগণ বলেন, ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নত।

ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববী (র.) (৬৩১-৬৭৬ হি.) তাঁর 'তাকরীব' কিতাবে লেখেন-

ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام (التقريب والتيسير للنووي)

অনুবাদ: হাদীস বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের নিকট সনদের ক্ষেত্রে উদারতা অবলম্বন ও মাওযু ব্যতীত যঈফ হাদীস রেওয়ায়েত করা এবং এর উপর আমল করা জায়িয। হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ না করেও জায়িয। তবে তা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়। (আততাকরীব ওয়াত্তাইসীর লিন নববী)

মুহাদ্দিসগণের নিকট শরীআতের আহকাম ও আকাইদ ব্যতিত সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসও বর্ণনাও জায়িয। এমনকি যঈফ হাদীসের দুর্বলতার উপর তাম্বীহ করাও আবশ্যক নয়। মোট কথা উপদেশ, আমলের ফযীলত, তারগীব ও তারহীবের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস বর্ণনা জায়িয। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনুস সালাহ

তার مقدمة গ্রন্থে লেখেন-

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما . وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد.

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর গুণাবলী, শরীআতের আহকাম যেমন হালাল, হারাম ইত্যাদি ও আকাইদ ব্যতিত অন্যান্য সকল বিষয় যেমন উপদেশ, ফযীলত, উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য যঈফ (দুর্বল) হাদীস বর্ণনা করা হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে জায়িয।

স্বয়ং ইমাম বুখারী (র.)ও ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আহকাম ও আকাঈদের ক্ষেত্রে তিনি হাদীস চয়নে খুবই কঠোর হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ছিলেন নমনীয়। যেমন তার লিখিত 'আল আদাবুল মুফরাদ' 'তারীখে কবীর', 'তারীখে সগীর' ইত্যাদি কিতাবে যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। যদি যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ জায়িয না হত তাহলে তিনি কেন তাঁর কিতাবসমূহে যঈফ হাদীস আনলেন? তাহলে কি বলা যাবে ইমাম বুখারী (র.)-এর হাদীস জ্ঞানের অভাব ছিল? (**نعوذ بالله**)

হাফিয ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিতে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা জায়িয ও মুস্তাহাব

গায়র মুকল্লিদগণ হাফিয ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণ করেন বলে দাবি করেন অথচ ইবনে তাইমিয়া মৃতের তালকীন সম্পর্কে বলেন-

وروى في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين، مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم. (**إقتضاء الصراط المستقيم**)

অর্থাৎ মৃতের দাফনের পর তালকীন সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত তার সনদ দুর্বল। কিন্তু পূর্বসুরী শামের আলিমগণ এর উপর আমল করেছেন। এ কারণে আমাদের অধিকাংশ লোকদের নিকট ও অন্যান্যদের নিকট তা মুস্তাহাব। (ইকতিদাউস সিরাতাল মুস্তাকীম)

ইবনে তাইমিয়ার উক্ত মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসের সনদে দুর্বলতা

থাকলেও অর্থাৎ হাদীস যঈফ হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আমল করা জায়িয ও মুস্তাহাব।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীও الروح কিতাবে তালকীনকে মুস্তাহাব বলেছেন।

উল্লেখ্য, আল্লাহর রাসূলের হাদীস নয় এমন কোন উক্তিকে তাঁর উক্তি বলা প্রসঙ্গে যেমন ভয়ংকর পরিণতির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তেমনি কোন হাদীসকে হাদীস না বলাও হাদীস অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে যায়। বর্তমান সময়ে দেখা যায়, কেউ কেউ কোন কোন হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তা পরিত্যাগ করার সুযোগ অন্বেষন করেন। যেমন কোন হাদীস সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের لا يصح (সহীহ নয়), لا يثبت (ছাবিত নেই) ইত্যাদি মন্তব্যকে তারা হাদীস প্রত্যাখ্যানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের এ কৌশল তাদের মুর্খতার পরিচয় প্রদান করে। কারণ উসুলে হাদীসের পরিভাষায় এসব উক্তি হাদীস অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দলীল নয়। আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী (র.) তাঁর লিখিত কিতাবে এ প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য হাদীস বিশেষজ্ঞদের উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

كثيرا ما يقولون لا يصح ولا يثبت هذا الحديث ويظن منه من لا علم له انه موضوع او ضعيف وهو مبني على جهلة بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم فقد قال علي القاري في تذكرة الموضوعات لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع انتهى وقال في موضع اخر لا يلزم من عدم صحته وضعه.

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار المسمى بنتائج الافكار ثبت عن احمد بن حنبل انه قال لا اعلم في التسمية أي في الوضوء حديثا ثابتا قلت لا يلزم من النفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال ان يراد بالثبوت لصحة فلا ينتفي الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع.

وقال نور الدين السمهودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين قلت لا يلزم من قول احمد في حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء لا يصح ان يكون باطلا فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به اذ الحسن رتبته بين الصحيح والضعيف.

وقال الزركشي في نكته على ابن صلاح بين قولنا موضوع وبين قولنا لا يصح بون كثير فان الاول اثبات الكذب والاختلاق والثاني اخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه اثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح ونحوه انتهى وقال ايضا لا يلزم منه ان يكون موضوعا فان الثابت يشمل الصحيح والضعيف دونه.

وقال الحاحظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند احمد في بحث حديث عموم مغفرة الحجاج لا يلزم من كون الحديث لم يصح ان يكون موضوعا انتهى

وقال على القاري في تذكرة الموضوعات تحت حديث من طاف بهذا البيت اسبوعا مع ان قول السخاوي لا يصح لا ينافي الضعف والحسن.

وقال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية للقسطلاني عند ذكر حديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشترك او مشاحن ونقل القسطلاني عن ابن رجب ان ابن حبان صححه فيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء الا ان يريد نفي الصحة الاصطلاحية فان حديث معاذ هذا حسن لا صحيح . (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)

অর্থাৎ কোন কোন মুহাদ্দিসীনে কিরাম কোন হাদীস সম্পর্কে لا يصح (অসহীহ নয়) অথবা لايثبت (সাবিত নেই) মন্তব্য করেন। তা দেখে অনেক অজ্ঞ লোক এটাকে موضوع (মউযু) বা ضعيف (দুর্বল) বলে ধারণা করেন। এটি তাদের হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল। মোল্লা আলী কারী (র.) تذكرة الموضوعات কিতাবে লেখেন عدم ثبوت (সাবিত নেই) কথা দ্বারা হাদীস موضوع (মউযু) হওয়াকে আবশ্যক করে না।

হাফিয ইবনে হাজার (র.) الاذكار গ্রন্থের হাদীসের তাখরীজ সম্পর্কিত তদীয় نتائج الافكار কিতাবে লেখেন- ওযুতে বিসমিল্লাহ পড়া প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি ওযূতে বিসমিল্লাহ পড়া সম্পর্কিত কোন হাদীস জানি না। আমি বলি, কারো না জানা বাস্তবে তা না থাকা সাবিত করে না। যদি তা মেনে নেওয়াও হয় তবুও সাবিত না থাকা যঈফ হওয়াকে সাবিত করে না। কারণ হতে পারে ثابت (প্রমাণিত) দ্বারা صحيح

(সহীহ) বুঝানো হয়েছে, তাহলে তা حسن (হাসান) হতে পারে। যদি তাও মেনে নেয়া যায়; তাহলেও প্রত্যেক فرد এর নফী দ্বারা পুরো বিষয়টি نفي (না বাচক) হয়ে যায় না।

নূর উদ্দীন সামহুদী جواهر العقدين فى فضل الشرفين এর মধ্যে বলেন: আশুরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য বেশি বেশি খরচ করার হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.)-এর উক্তি لا يصح (সহীহ নয়) দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায় না। বরং এটি غير صحيح (সহীহ নয় এমন) হতে পারে যা দলীল হিসেবে গ্রহণের যোগ্য, যখন এটি 'হাসান' হবে। এর স্তর সহীহ ও যঈফ হাদীসের মধ্যখানে।

যরকশী نكت ابن الصلاح গ্রন্থে বলেন, আমাদের কথা موضوع (মউযু) ও لا يصح (সহীহ নয়) এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কারণ প্রথমটি মিথ্যা হওয়া সাবিত করে অপরদিকে দ্বিতীয়টি সাবিত না থাকার সংবাদ দেয়। আর সাবিত না থাকা বাস্তবে না থাকা বুঝায় না। একথা এমন সকল হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেগুলো সম্পর্কে ইবনুল জাওযী لا يصح (সহীহ নয়) বলেছেন।

মোল্লা আলী কারী বলেছেন সাখাবীর উক্তি لا يصح (সহীহ নয়) যঈফ ও হাসানকে নফী করে না।

যুরকানী বলেন- আল্লামা কাসতালানী (র.) ইবনে রজব থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। এতে ইবনে দেহইয়ার সেই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যাতে তিনি বলেছিলেন- 'শাবানের মধ্যরাতের ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই।' যদিও তিনি সহীহ দ্বারা পারিভাষিক সহীহ বুঝিয়েছেন। কারণ মু'আয (রা.)-এর হাদীস সহীহ নয় বরং হাসান। (আর রাফউ ওয়াত তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল, পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৭)

হাদীস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন ফকীহদের কাজ

আহলে হাদীসগণ কেবল হাদীস থেকে সকল মাসআলার সমাধান চান। অথচ হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা থেকে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। এর কয়েকটি নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

সাহাবীগণের উপস্থিতিতে ইবনে আব্বাস-এর অনন্য ফিক্হী যোগ্যতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিষ্য মুজাহিদ ইবনে জুবাইর (ওফাত : ১০২হিজরী) বলেন- আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র- আতা,

তা'উস ও ইকরামা চারজন বসা ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস নামায পড়ছিলেন। ঐ সময় এক ব্যক্তি হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন মুফতী আছে কি? আমি বললাম, তুমি প্রশ্ন কর। তখন সে বলল, আমি যখনই পেশাব করি, তখন পেশাবের পরে উত্তেজিত বীর্য বের হয় (এর কারণে কি গোসল ওয়াজিব হবে?) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলি কি ঐ বীর্য যা সন্তানের জন্ম দেয়। সে বলল- হ্যাঁ। তখন আমরা সকলে বললাম- হ্যাঁ, গোসল ওয়াজিব হবে। তখন সে ব্যক্তি তা শুনে চলে যাচ্ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দ্রুত নামায শেষ করলেন এবং ইকরামাকে বললেন, ঐ ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি ডাক। যখন সে আসল তখন প্রথমে আমাদের বললেন, তোমরা কি কুরআন দ্বারা ফতওয়া দিয়েছে? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তোমরা সাহাবীদের উক্তি দ্বারা ফতওয়া দিয়েছো? আমরা বললাম, না। তখন বললেন, তাহলে তোমরা কিসের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছ? আমরা বললাম, নিজের রায় মতে। তা শুনে তিনি বললেন, এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন ফকীহ শয়তানের নিকট হাজার ইবাদতকারীর চেয়েও কঠিন। আমাদের উপস্থিতিতে হযরত ইবনে আব্বাস ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বল, পেশাবের সময় যে ধাতু বের হয় তখন তোমার অন্তরে কি কোন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়? সে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, বীর্য বের হওয়ার পর কী পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তা সেরকম ফোটা যা পড়তে থাকে, তোমার জন্য ওযুই যথেষ্ট। (ফিরয়াবী, কিতাবুস সিয়াম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬)

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখলেন, 'উত্তেজিত পানি' (ماء دفق - শক্তিশালী ও হরকত বিশিষ্ট বীর্য) শব্দের কারণে তাঁরা (শিষ্যরা) ধোঁকায় পড়েছেন এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থ দেখে তাঁরা গোসল ফরয হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন। তাঁরা গোসলের কারণ চিন্তা-ভাবনা করেননি। তা দ্বারা বুঝা গেল তাঁদের মধ্যে কেউ ফকীহ নন। যদি ফকীহ হতেন তারা নিশ্চয় গোসল ওয়াজিবের কারণের উপর চিন্তা করতেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রশ্ন করে যখন নিশ্চিত হলেন তার বর্ণনাকৃত অবস্থায় গোসল ওয়াজিবের কারণ (এমন বীর্য যা দ্বারা সন্তানের জন্ম হয়) বিদ্যমান নেই তখন তিনি ফতওয়া দিলেন, তা আসলে বীর্য নয়, তাই গোসল ওয়াজিব হবে না। এ থেকে বুঝা যায়, ফকীহের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় হাদীসে এসেছে তার জন্য উঁচুমানের অনুধাবন ও গভীর গবেষণা প্রয়োজন। হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত মুজাহিদ, আতা, তাউস, ইকরামা এর মত মুহাদ্দিসগণকে (যারা মক্কা শরীফের হাদীসের উস্তাদ ছিলেন) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ফকীহ মনে করেননি। কেননা, তারা কারণ বের করেননি। ফকীহদের প্রশংসা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি 'ফকীহগণ শয়তানের নিকট হাজার ইবাদতকারীর চেয়ে উত্তম' বলার কারণ, শয়তানের প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষ দ্বারা শরীআত বিরোধী কাজ করানো। কেননা, যারা সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত তাদের পক্ষে নস ও ইজতিহাদ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্জি মোতাবেক বিধান বের করার সুযোগ থাকে না। তেমনি মুহাদ্দিসগণ সনদ, মতন ও বর্ণনাকারীর পর্যালোচনায় ব্যস্ত থাকায় তাদেরও ঐ সুযোগ থাকে না। তা তো শুধুমাত্র ফকীহদের কাজ, যারা প্রত্যেক মাসআলায় সংশ্লিষ্ট হাদীস ও কারণ নির্ণয় করে নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান বের করেন। (ইমাম আবূ হানীফা হাদীস শাস্ত্রের প্রধান ইমাম, প্রফেসর ড. তাহির আল-কাদরী, পৃষ্ঠা-৮০)

মুহাদ্দিসগণের উপস্থিতিতে ইমাম আবূ সওরের অনন্য ফিকহী যোগ্যতা

মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারাও বুঝা যায় যা ইমাম হাসান ইবনে আব্দুর রহমান রামহারমুযী (ওফাত : ৩৬০ হিজরী) ও আবূ বকর খতীব বাগদাদী, (ওফাত : ৪৬৩ হিজরী) বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, মুহাদ্দিসগণের এক সমাবেশে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবূ খায়ছামা ও খালফ ইবনে সালিম উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা একটি হাদীস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ঐ সময় এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো হায়েযা (ঋতুস্রাবগ্রস্থ মহিলা) মৃত মহিলাকে গোসল দিতে পারবে? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তর দিলেন, না। সবাই একে অপরের দিকে দেখতে লাগলেন। ঐ সময় ফকীহ আবূ সওর আসলেন। তখন ঐ সকল মুহাদ্দিস প্রশ্নকারী মহিলাকে বললেন, তুমি তাঁর থেকে জিজ্ঞেস কর। সে তাঁর নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি ফতওয়া দিলেন, হায়েযা মহিলা মৃত মহিলাকে গোসল দিতে পারবে। দলীল হিসাবে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, ওসমান ইবনে আহনাফ কাসিম থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন: إن حيضتك ليست في يدك অর্থাৎ তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই। (মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল হায়য, হাদীস- ২৯৮)

অন্য হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) থেকে বর্ণিত-

كنت أفرق رأس رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بالماء وأنا حائض.

আমি হায়েয অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারকে পানি দ্বারা চিরুনী করতাম।

ইমাম আবূ সওর বলেন, যখন তিনি পানি দ্বারা জীবিত ব্যক্তিকে চিরুনী করতে পারেন তখন মৃতকে কেন পারবেন না? তা শুনে উপস্থিত সকল মুহাদ্দিস তা সত্যায়িত করে বলেন, এই হাদীস আমাদের নিকট অমুক অমুক সূত্রে পৌঁছেছে। অতঃপর তারা বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনার উপর গবেষণা করতে লাগলেন। তখন মহিলাটি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, فأين كنتم إلى الآن- তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? (রামহারমুযী : আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০)

এ সব ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, হাদীস স্মরণ রাখা ও বর্ণনা করা মুহাদ্দিসগণের কাজ এবং তা থেকে সমাধান বের করা ফকীহগণের কাজ। তাই একজন মুহাদ্দিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত শব্দ বা তাঁর কাজ বা আমলকে হুবহু বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের ভাব বর্ণনা করা তাঁদের যিম্মাদারী নয়। তাঁদের কাজ তো শুধুমাত্র হুবহু বর্ণনা করে দেয়া। যেমন- কুরআনের হাফিয কুরআন শরীফ মুখস্থ করে হুবহু শুনিয়ে দেন। তেমনি মুহাদ্দিস হাদীসকে মুখস্থ করে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করে দেন। তিনি দেখেন না ঐ হাদীসের কী আলামত? তার মর্ম কী? তার বিভিন্ন শব্দের অর্থ কী? তার উদ্দেশ্য কী? ইত্যাদি ইত্যাদি। নস দ্বারা বর্ণিত বিধানের কারণ, তেমনি বিভিন্ন অর্থের উত্তর দেয়া একজন মুহাদ্দিসের কাজ নয়; বরং তা ফকীহ ও মুজতাহিদের কাজ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হাদীস বর্ণনাকারী ও ফকীহের মাঝে পার্থক্য হলো, বর্ণনাকারী হলেন মুহাদ্দিস আর ফকীহ হলেন মুজতাহিদ। তাই যারা খুব সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা করেন তাঁরা হাদীস বর্ণনা ও অনুধাবনে বিজ্ঞ হওয়ার কারণে মুহাদ্দিস হয়েছেন এবং যে সকল আলিম হাদীসের অর্থ অনুধাবন করার কারণে তাতে বিদ্যমান বিধানের কারণ বের করে ঐ সব হাদীসের সঠিক অর্থ ও তত্ত্বকে উম্মত পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন তাঁরা হাদীসতত্ত্বের বিজ্ঞ হয়ে ফুকাহা হয়েছেন।

ইলমুল হাদীস ও ফিকহুল হাদীসে এ মৌলিক পার্থক্যের কারণে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণের মধ্যে প্রত্যেক যুগে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদি আমরা সাহাবীদের যুগেই দৃষ্টি রাখি তখন আমরা বুঝতে পারব তাঁদের মাঝে মুহাদ্দিস ও ফকীহর দুটি স্তর ছিল। (ইমাম আবূ হানীফা হাদীস শাস্ত্রের প্রধান ইমাম, পৃষ্ঠা-৮২)

ইলমে ফিক্হ শিক্ষাদানের জন্য সাহাবীদের সফর

হযরত আছিম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (ওফাত : ১২০ হিজরী) থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের পরে বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ থেকে কিছু দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু, আমরা মুসলমান, আপনি আমাদের নিকট নিজের কিছু সাহাবী পাঠান যারা আমাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিক্হ) শিখাবেন, কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দিবেন এবং শরীআতের আহকাম শিখাবেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছয়জন সাহাবাকে পাঠালেন। (আসকালানী : আল ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০৪, হাদীস : ২৯০০, আসকালানী : ফতহুল বারী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৮০)

সাহাবায়ে কিরাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশার দরবারে

ইমাম যাহাবী (ওফাত : ৭৪৮ হিজরী) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি রাসূলের খলীফা হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যা। তিনি প্রধান ফকীহদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ফকীহ সাহাবীগণ (অনেক সময় সমস্যা সমাধানের জন্য) তাঁর শরণাপন্ন হতেন। একটি দল তাঁর থেকে ফিক্হ শিখেছেন। (যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭, ইবনুল জাওযী : সিফাতুস সাফওয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স যিনি আবূ মুসা আশআরী নামে প্রসিদ্ধ (ওফাত : ৫০হিজরী) তাঁর (আয়শা (রা.)-এর) ফিক্হী মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কেউ হাদীস অনুধাবনে কোন সমস্যায় পড়লে তখন হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার শরণাপন্ন হতাম এবং তাঁর থেকে সমাধান পেয়ে যেতাম। (যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭, ইবনুল জাওযী : সিফাতুস সাফওয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২)

আকাবির সাহাবা হযরত মুআয ইবনে জাবালের দরবারে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সওর যিনি আবূ মুসলিম খাওলানী নামে প্রসিদ্ধ (ওফাত : ৬২ হিজরী) সিরিয়ার জামে মসজিদে হিমসের এক ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, আমি হিমসের মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন ত্রিশজন বয়স্ক সাহাবী দেখলাম। তাদের মাঝে একজন যুবক দেখলাম যার চক্ষুদ্বয় সুরমা সুললিত, দাঁত ধবধবে

সাদা আর তিনি নিশ্চুপ বসে আছেন। যখন সেখানে সাহাবীদের কোন মাসআলায় সমস্যা দেখা দিত তখন তাঁরা অগ্রসর হয়ে তাঁর থেকে জেনে নিতেন। আমি আমার সাথীদের জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? তারা বলল, হযরত মুআয ইবনে জাবাল। (যাহাবী : সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৩)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ১১০হিজরী) বলেন, আমি কুফায় গেলাম তখন আমি সেখানে ইমাম শা'বীর অনেক বড় পাঠশালা দেখলাম। অথচ ঐ সময় রাসূলের অনেক সাহাবায়ে কিরাম বিদ্যমান ছিলেন। (যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায)

এ কারণে ইমাম ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম সালমা ইবনে আব্দুল্লাহকে যিনি আবূ বকর হাযলী নামে প্রসিদ্ধ (ওফাতঃ ১৬৭ হিজরী), নসীহত করে বলেন, হে আবূ বকর! যখন তুমি কুফায় যাবে, তখন শা'বীর দরসে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হতো। (যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮১)

ইমাম মালিক (র.) বলেন- ইমাম রবীআ মদীনা শরীফের ইফতার (ফতওয়া দানের) মসনদে সমাসীন ছিলেন। তাঁর আসরে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ উপস্থিত হতেন এবং তাঁর থেকেই ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিকাহশাস্ত্র অর্জন করেছেন। (যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮)

এ আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিগণ হাদীসের মর্ম অনুধাবনের জন্য প্রত্যেক যুগে ফকীহগণের শরণাপন্ন হতেন এবং তাঁদের থেকে ফিকহ শিখতেন। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, প্রথম যুগ তথা সাহাবীদের যুগ থেকে মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ পর্যন্ত ফকীহ পাওয়া যেত দু'একজন এবং মানুষের মধ্যে তাদের মর্যাদা ছিল অপরিসীম আর মুহাদ্দিসগণের মাঝে বড় বড় ফকীহ ছিলেন না; বরং এ বিষয় প্রত্যেককে মহান আল্লাহ তাঁর বন্টন অনুসারে দিয়ে থাকেন। তাই ইমাম আযমের যুগে যদিও ইমাম মালিক, ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শুবরামা, সুফিয়ান সওরী, দাউদ ইবনে আবী হিন্দ ও আওযায়ীর মত প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিদ্যমান ছিলেন তারপরও কুরআন হাদীস থেকে সমাধান বের করার যে সূক্ষ্ম চিন্তা, প্রতিভা ও মেধা ইমাম আযমের ভাগ্যে জুটেছিল পৃথিবীতে তা আর কারো ভাগ্যে জুটেনি। হাদীস অনুধাবনে তাঁর ঐ উচুঁমানের যোগ্যতার কারণে তাঁর যুগ পর্যন্ত বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করাকে

ধন্য হবার উপলক্ষ মনে করতেন এবং তাঁর ওফাতের পর বিভিন্ন কঠিন-জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াতে তাঁরা তাঁকে স্মরণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতেন। (ইমাম আবূ হানীফা হাদীস শাস্ত্রের প্রধান ইমাম, পৃষ্ঠা-৯৫)

গায়র মুকাল্লিদগণের কথা ও কাজে অসঙ্গতি

বিশ রাকাআত তারাবীহ অস্বীকার করে পুরো রমদ্বানে জামাআতে তারাবীহ আদায়

হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ রাকাত তারাবীহর ব্যবস্থা করেছিলেন। গায়র মুকল্লিদগণ তাঁর এ পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হতে না পেরে একে 'বিদআতে ওমরী' (?) বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। তারা তাঁর বিশ রাকাত তারাবীহতে নারায হলেও অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু সন্তুষ্ট। যেমন পুরো রমযানে তারাবীহর জামাআত করেন তারা, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিনের বেশি জামাআত করেননি। শুধু কি তাই! পুরো কুরআন খতম করা বা বিতর নামায জামাতে পড়া ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই। এগুলো সবই ওমর (রা.)-এর নেয়া পদক্ষেপ। তারাবীহ'র রাকাত নিয়ে প্রশ্ন থাকলে 'খতমে কুরআন', 'জামাতবদ্ধ বিতর' ও 'পুরো রমযানে জামাতবদ্ধ তারাবীহ' নিয়ে প্রশ্ন নেই কেন? এগুলো কি হাদীসের কোথাও আছে? মারফু, মুত্তাসিল, সহীহ, সরীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণ করতে পারবেন কি?

হযরত আয়শা (রা.)-এর ৮রাকাআতের হাদীস ও গায়র মুকাল্লিদীন কর্তৃক এর উপর আমল

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- **بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ** (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক রামাদ্বান মাস ও অন্যান্য সময়ে রাতের নামায অধ্যায়)। উক্ত অধ্যায়ে তিনি হযরত আয়শা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ

عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

অর্থাৎ হযরত আবূ সালামা বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়শা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, রামাদ্বান শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায কিরূপ ছিল? জবাবে তিনি বলেন- রামাদ্বান ও অন্য সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাআত নামায পড়তেন। এগুলো কত সুন্দর আর কত দীর্ঘ হত এ প্রশ্ন তুমি করনা। এরপর আরও চার রাকআত পড়তেন। এর সৌন্দর্য আর দৈর্ঘ্য নিয়ে তুমি প্রশ্ন করনা। এরপর তিনি তিন রাকআত নামায পড়তেন। হযরত আয়শা (রা.) বলেন- আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি কি বিতর পড়ার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়বেন? "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- হে আয়শা! আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।

গায়র মুকাল্লিদগন ৮রাকাআত তারাবীহকে সুন্নাত প্রমাণ করার জন্য উল্লেখিত হাদীসকে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করেন এবং তারাবীহর নামায ২০ রাকাআত সম্পর্কিত সকল হাদীসকে এর সাথে বিরোধপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ এ হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত, তারাবীহ সম্পর্কিত নয়, যার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে স্বয়ং গায়র মুকাল্লিদগণই এর উপর আমল করছেন না। আমলতো দূরে থাক, তারা এর বিরোধিতা করছেন। এর কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকাআত করে নামায পড়তেন অথচ গায়র মাকাল্লিদগণ দু'রাকআত করে পড়েন।

২. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা একা নামায পড়তেন। কারণ হাদীসে তাঁর নামায পড়ার আলোচনা হয়েছে, পড়ানোর নয়। কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ পুরো রামাদ্বান মাস জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়েন।

৩. উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামায ঘরে পড়তেন। কারণ হাদীসে আছে, হযরত আয়শা (রা.) রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করেছিলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি বিতর না পড়েই ঘুমাবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন- হে আয়শা, আমার চোখগুলো ঘুমালেও অন্তর ঘুমায় না। এরূপ প্রশ্নোত্তর থেকে বুঝা যায় বিষযটি ঘরের বিষয় ছিল, কারণ সফরের অবস্থায় না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরেই ঘুমাতেন। অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ সারা রামাদ্বান মাস ঘরের বদলে মসজিদেই এ নামায পড়ে থাকেন।

৪. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন। ঘুম থেকে উঠে বিতর পড়তেন। অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ তারাবীহর সাথে সাথে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর আদায় করে নেন।

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা একা বিতর আদায় করতেন, অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ জামাআতের সাথে বিতর আদায় করেন।

৬. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা বছর বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাআত পড়তেন, কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ বেশির ভাগ সময়ে এক রাকআত বিতর পড়েন। কখনো তিন রাকাআত পড়লে তা দু'সালামে পড়েন।

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) থেকে হাদীস গ্রহণ

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ছিলেন ভারতবর্ষে হানাফী মতাবলম্বীদের মুকতাদা। তিনি মদীনা শরীফে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে মাতৃভূমিতে হাদীস শিক্ষা দানের জন্য ফিরে আসেন এবং আজীবন হাদীসের খিদমত করে যান। তার সম্পর্কে গায়র মুকাল্লিদদের বিশিষ্ট আলিম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী **تحفة الاحوذي** গ্রন্থের **الفصل في شيوع علم الحديث في ارض هند** অধ্যায়ে লেখেন-

من الله تعالى على الهند بإفاضة هذا العلم على بعض علمائها كالشيخ عبد الحق بن سيف الدين الترك الدهلوي المتوفى سنة اثنتين وخمسين وألف وأمثالهم وهو أول من جاء به في هذا الإقليم وأفاضه على سكانه في أحسن تقويم

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু উলামায়ে কিরামকে ইলমে হাদীসে সমৃদ্ধ করে ভারতবর্ষের প্রতি ইহসান করেছেন। তন্মধ্যে একজন হলেন- শায়খ আব্দুল হক

বিন সাইফ উদ্দীন আত তুরক আদ দেহলভী (র.)। তিনিই প্রথম এই উপমহাদেশে হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং অতি সুন্দর রূপে এর অধিবাসীদের কাছে তা সম্প্রসারণ করেছেন।

এ ছাড়াও তিনি এ প্রসঙ্গে আরও দু'জন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন- তারা হচ্ছেন আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.)-এর ছেলে নুরুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, উপরোক্ত তিনজন মুহাদ্দিসই ছিলেন হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ও শ্রেষ্ঠ ফকীহ। তাহলে গায়র মুকাল্লিদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী এদের রেফারেন্সে হাদীস গ্রহণ করেন কিভাবে? তার দৃষ্টিতে তো তাঁরা গ্রহণযোগ্য না হওয়ারই কথা। তা ছাড়া গায়র মুকাল্লিদগণই কেবল হাদীস চর্চা করেন, অন্যরা হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের এ দাবি উপরোক্ত কথা থেকেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খতমে বুখারীর ফদ্বীলত : পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

ভারতীয় গায়র মুকল্লিদ তথা লা-মাযহাবীগণের ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী (**تحفة الاحوذى**) গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফ খতমের ফদ্বীলত বর্ণনা করতে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করেছেন। যেমন-

হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) বলেন:

وكتاب البخاري الصحيح يستشفي بقرائته الغمام وأجمع علي قبوله وصحة ما فيه أهل الاسلام–

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ হাসমা বলেন:

ان صحيح البخاري ما قرئ فيه في شدة الا فرجت ولا ركب به في مركب إلا نجت–

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন:

قرأ كثير من المشائخ والعلماء والثِّقات صحيح البخاري لحصول الْمُراداتِ وكفاية الكمهمات وقضاء الحاجات ودفع البليَّات وكشف الْكربات وصحة الامراض وشفاء الْمرضي وعند المُضائق والشدائد فَحَصَل مُرادهم–

মুহাদ্দিস সাইয়িদ জামাল উদ্দীন বলেন:

قرأت صحيح البخاري نحو عشرين ومأة قي الوقائع والمهمات لنفسي وللناس الاخرين

فبأي نية قرأته حصل المقصود وكفي المطلوب–

এরপর তিনি (আবদুর রহমান মুবারকপুরী) নিজের মতামত তুলে ধরেন এভাবে:

قلت قد اجاز كثير من اهل العلم في هذا الزمان قرائة صحيح البخاري وختمه لشفاء الامراض ودفع المصائب وحصول المقاصد فيجتمعون ويقرء بعضهم الجزء الاول مثلا وبعضهم الجزء الثاني وبعضهم الجزء الثالث– وهكذا فيختمونه باجتماعهم ثم يدعون الله تعالي لشفاء مرضاهم او لدفع مصائبهم او لحصول مقاصدهم– واستدلوا علي ذالك بأن فرائته بتمامه رقية لشفاء المرضي ودفع المصائب ولحصول مقاصدهم والرقية بما ليس فيه شرك ولا كلمة لا يفهم معناها جائزة بالاتفاق– مقدمة تحفة الاحوذي–ص 88)

উপরোক্ত ইবারতসমূহের সারকথা হলো- উদ্দেশ্য পূরণ, বালা মুসীবত দূর, রোগমুক্তি ইত্যাদি যে কোন উদ্দেশ্যে বুখারী শরীফ তিলাওয়াত করলে বা পূর্ণ খতম করলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। আবদুর রাহমান মুবারকপুরী নিজেও খতমে বুখারীর ফদ্বীলতের পক্ষে।

কিন্তু তার পরবর্তী গায়র মুকল্লিদগণ খতমে বুখারীর ফদ্বীলতকে অস্বীকার করেন। এমনকি একে শিরক পর্যন্ত বলে থাকেন। উক্ত কিতাবের প্রান্তটিকায় তারা এরূপ উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়
কুফাবাসী ও ইমাম আবূ হানীফার প্রতি লা-মাযহাবীদের ক্ষোভ

কুফাবাসীদের প্রতি লা-মাযহাবীদের ক্ষোভ

গায়র মুকাল্লিদগণ কুফা নগরীকে এ পরিমাণ ঘৃণা করে যে, তাদের মতে কুফাই হচ্ছে সকল ফিতনার উৎপত্তিস্থল। তাদের মতে কুফাবাসী ইলমে হাদীস সম্পর্কে অমনযোগী। সেখানে কেবল রায় ও কিয়াসের চর্চা হয়। যদি কুফার কোন মুহাদ্দিসের কাছে কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে তাদের দু' একজনের মতামত উল্লেখ করা হল।

গায়র মুকাল্লিদগণের প্রখ্যাত আলিম ও মুনাজির ইয়াহইয়া গান্দলবী লেখেন- জন্মলগ্ন থেকেই কুফা ফিতনার উৎপত্তিস্থল হিসেবে পরিচিত। সকল ফিতনার সম্পর্ক কুফা বা ইরাকের সাথে রয়েছে। ইসলামের রায় ও কিয়াস প্রবিষ্ট হওয়াও ছিল এক বড় ফিতনা। সুতরাং রায় কুফাকে তার কেন্দ্রস্থল বানিয়ে দিল। ইসলামে কিয়াস প্রবিষ্ট হওয়ার পর ইরাকের কিছু আলিম এর প্রতি মনযোগী হয়ে পড়েন এবং বেশি বেশি করে কিয়াস ও রায় এর ব্যবহার করতে থাকেন। এ কারণে তাদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার সংখ্যা কমে যায়। কিছু পরিপার্শ্বিক প্রভাবে সেখানকার লোকজন সাহাবায়ে কিরামের পাক পবিত্র রীতি ত্যাগ করে কিয়াস ও রায় এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। (দাস্তানে হানফিয়া, পৃষ্ঠা- ২১)

তিনি অন্যত্র বলেন- 'সর্বকাল থেকে কুফা বিদআত ও নব আবিস্কৃত কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থল হয়েই আছে। ইসলামবিদ্বেষী সকল দল এই যমীনকে তাদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে। ইসলামে এমন কোন বিদআত জারী হয়নি যার জন্মস্থলের মর্যাদা কুফা লাভ করেনি। মিথ্যা ও জাল হাদীসের ধারাবাহিকতার শুরু ইরাক ও কুফা থেকেই হয়েছে। ارجاء - اعتزال ও আহলে রায় এর বাতিল দৃষ্টিভঙ্গি এরই মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এ কারণেই আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন ঐ সকল বাতিল দৃষ্টিভঙ্গির ধারকদের বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং একথা প্রকাশ করেছেন যে, ঐ সকল লোক হাদীসের মধ্যে মিথ্যার মিশ্রন থেকে বিরত থাকত না। এজন্য তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, একথা ঠিক

যে, কুফায় কিছু আহলে ইলম ছিলেন যারা রায় ও কিয়াসের বিপরীতে হাদীস ও আসারসমূহের উপর আমল করতেন। তাদের মসলক ছিল মুহাদ্দিসীনের মসলক। কুফায় অবস্থান করেও তারা কুফাবাসীদের মাযহাবকে ঘৃণা করতেন। (خير البراهين পৃষ্ঠা- ২৪)

গায়র মুকাল্লিদীনদের আরেক বড় আলিম মিয়া নজীর হুসাইন এর ছাত্র আব্দুস সামাদ বসতবী ফিকহ এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন– ইরাকীদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস, সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসমূহ খুবই কম ছিল। তাদের মধ্যে এর আগ্রহও কম ছিল। এ কারণে যে, তাদের মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তি ছিল রায় ও কিয়াস। হাদীস ও আসার এর অনুসরণ ত্যাগ করে রায় ও কিয়াসের প্রতি তাদের আসক্তি ছিল বেশি। এ কারণে তারা আহলে রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইমাম বুখারী (র.)-এর কুফা গমন

লা-মাযহাবী লেখকগণের পূর্বোক্ত বক্তব্যে কুফার প্রতি তাদের বিদ্বেষ কতটুকু তা পরিলক্ষিত হয়। তাদের এ বিদ্বেষও স্ববিরোধী। কেননা প্রথমত তারা সর্বক্ষেত্রে হাদীসের উপর আমল করতে চান। আর সে হাদীস হতে হবে ইমাম বুখারী (র.)-এর সংকলিত বুখারী শরীফে। আবার তারা কুফা ও ইরাকের আলিমগণকে হাদীসের অনুসারী বলতে নারাজ। অথচ ইমাম বুখারী (র.) কুফা ও ইরাক সম্পর্কে বলেন:

ذهبت الي الشام ومصر والجزائر مرتين والي البصرة اربع مرات واقمت بالحجاز ستة اعوام ولا احصي كم دخلت الي الكوفة وبغداد مع المحدثين . (هدي الساري– ص 478)

অর্থাৎ আমি শাম, মিশর ও জাযিরাতুল আরবে দুইবার গিয়েছি। বসরায় চার বার, হিজাযে ছয় বছর অবস্থান করেছি। আর কুফা ও বাগদাদের মুহাদ্দিসীনের কাছে কতবার যে গিয়েছি তা গণনা করতে পারছি না। (هدي الساري)

কুফা থেকে ইমাম বুখারী (র.)-এর হাদীস গ্রহণ

ইমাম বুখারী (র.) নিজে বলেন, আমি কুফার আবদুল্লাহ বিন মুসা (র.), আবূ নুআইম ফযল বিন দুকাইন, খালিদ বিন মাখলাদ, তলক বিন গান্নাম, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল মুকরী, আহমদ বিন ঈসা বিন আবান, হাসান বিন রবী, উমর বিন হাফস, উরওয়া, কাবীসা বিন উকবা, আবূ গাসসান প্রমুখ মুহাদ্দিসীনের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছি।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রথম দু'জন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র।

ইমাম বুখারী (র.)-এর বাগদাদ সফর

ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), যিনি কাযী আবূ ইউসুফ (র.)-এর ছাত্র, মুহাম্মদ বিন সাবিক, মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন তিবা, সুরাইজ বিন নু'মান প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি। হানাফী মাযহাবের ফকীহ ইমাম যাহাবী (র.) বলেন- ইমাম বুখারী (র.) এক হাজার আশি জন উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। (سير اعلام النبلاء جلد–12 صفحة–618)

ইমাম আবূ হাফস কবীর (র.)-এর ছেলে আবূ হাফস সগীর ইমাম বুখারী (র.)-এর অতি ঘনিষ্ট ছিলেন। এক সাথে হাদীসের ইলম অর্জনের জন্য সফর করেছেন। আবার ইমাম আবূ হাফস কবীর (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর ওয়ালিদ সাহেবের বন্ধু ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর ইলমে হাদীসের অন্বেষনে কুফা বাগদাদ ইত্যাদি স্থানে ভ্রমন থেকে দুটি বিষয় পরিস্কার হয় তা হলো :

০১। হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কিরামের সাথে ইমাম বুখারী (র.)-এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

ইমাম আবূ হাফস কবীর ও আবূ হাফস সগীর (র.) দু'জনই ছিলেন হানাফী মাযহাবের প্রবীন আলিম ও অনুসারী। এদিকে ইমাম বুখারী (র.) আবূ হাফস কবীর (র.)-এর দরসে হাদীসে বসতেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে **جامع سفيان** সম্পূর্ণ শুনেছিলেন। তিনিও ইমাম বুখারী (র.)-এর প্রতি পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ প্রদান করে তাঁর প্রসিদ্ধি প্রচার করেছিলেন। দুনিয়ার হাদীস চর্চাকারী মাত্রই এর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। আর ইমাম যাহাবীর মতে **أَبُو حَفْصٍ صغير** ছিলেন **ثِقَةً، إِمَاماً فِي الفِقْهِ، ذَا وَرَعٍ وَتَوَاضُعٍ** সিকাহ (বিশ্বস্ত), ফিকহের ইমাম, পরহেযগার ও বিনয়ী। (**سير أعلام النبلاء**)

ইমাম বুখারী (র.) দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইলম অর্জনে তাঁর সাথী ছিলেন। তিনি ইমাম ওকী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র.)-এর লিখিত কিতাব মুখস্ত করেছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর **جامع سفيان** শ্রবণ করেছিলেন। **এরা সকলেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন**। হযরত সুফিয়ান (র.) আলী বিন মুসহির (র.)-এর কাছ থেকে ইলমে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন, যিনি ইমাম

আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র। এমনকি সুফিয়ান সাওরী (র.) তাঁর **جامع** গ্রন্থে আলী বিন মুসহির এর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। ইয়াযিদ বিন হারুন বলেন-

كان سفيان ياخذ الفقه علي بن مسهر من قول ابي حنيفة وانه استعان به وبمذاكرته علي كتاب هذا الذي سماه الجامع– (**مقدمة كتاب التعليم للعلامة مسعود بن شيبة صفحة 133**)

০২। ইমাম বুখারী (র.) হারামাইন শরীফাইন সফর শেষে ইরাকে তাশরীফ নেন। সেখানে বসরা, কুফা, বাগদাদ ইত্যাদি স্থানের মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট সেখানকার ইলমে হাদীসের হাওলাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। সেখানকার মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র কাযী আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.), যারা নির্ভেজাল হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন, তাদের কাছ থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বুখারী শরীফের স্থানে স্থানে তা উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল যারা সব মাসআলায় বুখারী শরীফ থেকে দলীল চান, বা দিতে চান, আবার কুফা, বাগদাদ ইত্যাদি স্থানের উলামা, ফুকাহায়ে কিরামকে মানতে চান না তাদের আস্থা স্ব-বিরোধী হয় কি না পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখুন।

কুফার ইলমী অবস্থা

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কুফার জ্ঞান বিজ্ঞানের অবস্থা সে সময় কেমন ছিল, যার কারণে ইমাম বুখারী (র.) বার বার সেখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য গেলেন। এর জবাব ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

(ক) সাহাবায়ে কিরামের আগমন

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে হযরত সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ইরাক বিজয় করেন। অত:পর উমর (রা.)-এর নির্দেশে ১৭ হিজরীতে কুফা নগরী আবাদ করা হয়। এর পর সেখানে জলীলুল কদর অনেক সাহাবী তাশরীফ নেন। আল্লামা ইবনে সা'দ বলেন, ৭০জন বদরী সাহাবী এবং ৩০০ জন বায়আতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী কুফায় তাশরীফ নেন। (**طبقات ابن سعد، ج 6 ص 9**)

হাফিয আবূ বিশর বিখ্যাত তাবিঈ হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর সনদের বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক হাজার পঞ্চাশজন সাহাবী এবং ২৪ জন বদরী সাহাবী কুফায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। (كتاب الكني والاسماء، ج 1 ص 174)

ইমাম আবূল হাসান আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আজালী বলেন, কুফায় দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরাম আগমন করেন। (فتح القدير، ج 1 ص 91)

আল্লামা ইবনে সা'দ (র.) নাফে বিন জুবাইর (র.)-এর সনদে লিখেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, بالكوفة وجوه الناس অর্থাৎ কুফায় রয়েছেন শীর্ষস্থানীয় মানুষগণ। (طبقات ابن سعد، ج 6 ص 9)

(খ) হযরত উমর (রা.) এর চিঠি

কুফা বিজিত হওয়ার পর সেখানকার লোকজনকে ইসলামী জ্ঞান প্রদানের জন্য হযরত উমর (রা.) দুইজন সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির ভাষ্য হচ্ছে-

إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما واسمعوا، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. (تذكرة الحفاظ)

কুফার পত্তন থেকে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ কাল পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) অন্যান্য আরো অনেক গণ্যমান্য সাহাবী যেমনঃ সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস, হুযাইফা বিন ইয়ামান, আম্মার বিন ইয়াসির, সালমান ফারসী, আবূ মূসা আশআরী (রা.) মিলে কুফায় ইসলামী শিক্ষা ও ফিকহী মাসআলা শিক্ষা দিতে থাকেন। যার ফলে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কুফায় প্রায় চার হাজার আলিম তৈরী হয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা.) কুফায় প্রবেশ করে সেখানকার জ্ঞান চর্চা দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তিনি বলেন- **رحم الله ابن ام عبد قد ملا هذه القرية علما** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রহম করুন। তিনি এই জনপদকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.) কুফার মসজিদে অবতরণ করে চারশ'রও বেশি উলামায়ে কিরামকে অধ্যয়নরত দেখে বলেছিলেন-

لقد ترك ابن ام عبد هؤلاء سرج الكوفة– (تذكرة الحفاظ، ج 1 ص 14)

–নিঃসন্দেহে ইবনে উম্মে আবদ (ইবনে মাসউদ) (রা.) ঐ লোকদেরকে কুফার বাতি বানিয়ে ছেড়েছেন।

আবূ মুহাম্মদ রামহরমুযী (র.) স্বীয় কিতাবে হযরত আনাস বিন সিরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة ألالاف يطلبون الحديث واربعة مأة قد فقهوا. ((تذكرة الحفاظ، ج 1 ص 14 - المحدث الفاضل، ص 560)

অর্থাৎ আমি কুফায় আসলাম। সেখানে দেখতে পেলাম চার হাজার লোক হাদীস অধ্যয়ন করছেন। আর সেখানে চারশ ফকীহও পেলাম।

তাবাকাতে ইবনে সা'দ (**طبقات ابن سعد**) এর পুরো একখণ্ড (৬ষ্ঠ খণ্ড) কেবল কুফার সাহাবী, তাবিঈ ও তাবে তাবিঈন উলামায়ে কিরামের বর্ণনা রয়েছে যাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। অন্যান্য শহরে যার সংখ্যা এর দশমাংশও নয়।

ইমাম হাকীম (র.) **معرفة علوم الحديث** গ্রন্থে বিভিন্ন শহরের আইম্মায়ে হাদীসের বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কেবল কুফার আইম্মায়ে কিরামের বর্ণনা কিতাবের প্রায় ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী করেছেন, যেখানে অন্যান্য শহরের বর্ণনা এক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

হাফিয আবূ মুহাম্মদ স্বীয় কিতাবে মুত্তাসিল সনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) এবং বুখারী (র.)-এর উস্তাদ ইমাম আফফান ইবনে মুসলিম (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি কুফায় এসে চার মাস অবস্থান করলাম। আমি যদি চাইতাম তাহলে এক লাখ হাদীস সেখান থেকে গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি পঞ্চাশ হাজার হাদীস লেখলাম। আমি কুফায় এমন কোন লোক দেখিনি যিনি আরবীতে ভুল করেন এবং তা প্রচলিত রাখেন। (**المحدث الفاضل، ص 559**)

আল্লামা তাজ উদ্দীন সবকী (র.) **طبقات الشافعية** গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর ছেলে হাফিয আবূ বকর এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন: 'আমি কুফায় এসে

আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ (যিনি সিহাহ সিত্তার সকল মুসান্নিফের উস্তাদ) এর নিকট হতে ত্রিশ হাজার হাদীস লিখে নিলাম, যার মধ্যে মাকতু ও মুরসাল হাদীস রয়েছে। (طبقات الشافعية، ج 3 ص 308)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে কুফা ইলমে হাদীসে কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল। তা না হলে আফফান বিন মুসলিম (র.)-এর মতো মুহাদ্দিস ৪ মাসে ৫০ হাজার এবং আবূ বকর বিন আবূ দাউদ (র.) এক মাসে ৩০ হাজার হাদীস কিভাবে লিখতে পারতেন?

হযরত আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.) জানতে চেয়েছিলেন ইলম অর্জনকারীর জন্য একই উস্তাদের খিদমতে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে হাদীস লিখা উত্তম, নাকি ইলম চর্চার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম থেকে উপকৃত হওয়া উত্তম? জবাবে তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন স্থানে যাওয়া উত্তম। আর এ সকল স্থানের প্রথমেই তিনি কুফার নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন-

يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة (تدريب الراوي ج2 ص 85)

আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, আব্দুল জব্বার ইবনে আব্বাস (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

جالست عطاء فجعلت اسأله فقال لي ممن انت؟ فقلت من اهل الكوفة– فقال عطاء ما يأتينا العلم الا من عندكم– طبقات ابن سعد، ج 6 ص 11)

অর্থাৎ আমি হযরত আতা (রা.)-এর মজলিসে বসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন স্থানের লোক? আমি বললাম, কুফার লোক। তিনি বললেন- ইল্‌ম তো তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে এসেছে।

আতা বিন আবূ রাবাহ প্রসিদ্ধ তাবিঈ, ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর অনুরূপ উক্তি থেকেই তৎকালীন কুফার ইলমী সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হযরত আলী (রা.)-এর দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা

হযরত আলী (রা.) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন-

والله إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنها لقبة الإسلام وليأتين عليها يوم لا يبقى مؤمن إلا أتاها وحن إليها والله لينصرن بأهلها كما انتصر بالحجاز. (تاريخ الأمم والرسل الملوك، ج 2 ص 48)

অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম, নিশ্চয় কুফা হচ্ছে হিজরতের পর

হিজরতের স্থান। আর এটি হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। এমন একদিন আসবে যখন সকল মুমিন এখানে আসবে বা আসতে উৎসাহিত হবে। আল্লাহর কসম, অবশ্যই আল্লাহ এর অধিবাসীদেরকে সাহায্য করবেন যেমনিভাবে হিজায এর লোকদেরকে সাহায্য করেছেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর দৃষ্টিতে কুফার ফযীলত

ইমাম জুনদুব (র.) বলেন, আমি হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর সাথে হিরাত থেকে আসলাম। তখন তিনি দুইবার বললেন - الكوفة قبة الاسلام অর্থাৎ -কুফা হলো ইসলামের স্তম্ভ। (المصنف لابن ابي شيبة– ج 6– ص 40)

হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেছেন, الكوفة قبة الاسلام واهل الاسلام –কুফা হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের স্তম্ভ। (المصنف لابن ابي شيبة– ج 6– ص 40)

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর দৃষ্টিতে কুফার মর্যাদা

হযরত বিলাল বিন ইয়াহইয়া ঈসা (র.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেছেন-

ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر يدفع عنها من المكروه أكثر من أخبية وضعت في هذه البقعة (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 5 ص 391)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সাথে মদীনা শরীফের হিফাযতের পর এই কুফা শহরই সবচেয়ে বেশি হিফাযতে আছে।

তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে কুফার মুহাদ্দিসগণের আলোচনা

মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাফিযে হাদীসগণের বিভিন্ন অবস্থা সম্বলিত অনেক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র.) লিখিত তাযকিরাতুল হুফফায (تذكرة الحفاظ) গ্রন্থখানা। তিনি তাঁর গ্রন্থে হাফিযে হাদীস না হওয়ায় অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ এর নাম লিপিবদ্ধ করেননি। ইবনে কুতাইবা, খারিজা বিন যায়েদ, আল্লামা ওয়াকিদী, হিশাম কলবী (র.)-এর মতো বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস তাদের অন্যতম। এরপরও তিনি উক্ত গ্রন্থে কেবল কুফী মুহাদ্দিসগণের তালিকার উপর আলাদা শিরোনাম

উপস্থাপন করেছেন, যাদের সংখ্যা ১১০ জন। তারা হলেন-

1 علقمة بن قيس بن عبد الله فقيه العراقي الإمام 2 مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني 3 الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي 4 عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفى 5 سويد بن غفلة الكوفي 6 زر بن حبيش الإمام القدوة أبو مريم الأسدي 7 ربيع بن خثيم الإمام القدوة أبو يزيد الثوري 8 عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام 9 أبو عبد الرحمن السلمي 10 أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس القاضي 11 أبو المقدام شريح بن هانئ المذحجي 12 أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي 13 قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي 14 عمرو بن ميمون الإمام أبو عبد الله 15 أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفى 16 المعرور بن سويد أبو أمية الأسدي الكوفى 17 ابو عمر سعد بن اياس الشيباني 18 ربعى بن حراش الغطفاني العبسي الكوفى 19 إبراهيم بن يزيد التيمي 20 إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي 21 سعيد بن جبير 22 أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني 23 أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي 24 حبيب بن أبي ثابت الكوفي 25 الحكم بن عتيبة الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي 26 عمرو بن مرة الحافظ أبو عبد الله المرادي ثم الجملي الكوفي 27 القاسم بن مخيمرة الأمام أبو عروة الهمداني الكوفي- 28 عبد الملك بن عمير 29 -منصور بن المعتمر الإمام الحافظ الحجة أبو عتاب منصور السلمي الكوفي 30 مغيرة بن مقسم الفقيه الحافظ أبو هشام الضبي مولاهم الكوفي 31 حصين بن عبد الرحمن السلمي 32 سليمان بن فيروز الكوفي33 إسماعيل بن أبي خالد الإمام الحافظ أبو عبد الله البجلي- 34 أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي- 35 عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي- 36 أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي- 37 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 38 حجاج بن أرطاة الإمام النخعي الكوفي- 39 مسعر بن كدام الإمام الحافظ أبو سلمة الهلالي الكوفي- 40 أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي- 41 أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري- 42

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- 43 زائدة بن قدامة الإمام الحجة أبو الصلت الثقفي الكوفي- 44 الحسن بن صالح بن حي الإمام القدوة أبو عبد الله الهمداني الكوفي- 45 شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي- 46 أبو محمد قيس بن الربيع الحافظ الأسدي الكوفي- 47 ورقاء بن عمر بن كليب الكوفي- 48 شريك بن عبد الله النخعي الكوفي- 49 زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي- 50 القاسم بن معن بن عبد قاضي الكوفة- 51 أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي- 52 عبثر بن القاسم الحافظ الثقة أبو زبيد الزبيدي الكوفي- 53 سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي 54 أبو بكر بن عياش الإمام القدوة شيخ الإسلام الكوفي- 55 يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي- 56 عبد السلام بن حرب النهدي البصري ثم الكوفي- 57 جرير بن عبد الحميد الحافظ الحجة أبو عبد الله الضبي الكوفي- 58 بو خالد الأحمر الحافظ الصدوق سليمان بن حيان الأزدي الكوفي- 59 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي- 60 عيسى بن يونس أبي إسحاق السبيعي الكوفي- 61 عبد الله بن إدريس أبو محمد الأودي الكوفي- 62 يحيى بن يمان أبو زكريا العجلي الكوفي- 63 حميد بن عبد الرحمن أبو عوف الرواسي الكوفي- 64 علي بن مسهر أبو الحسن القرشي الكوفي- 65 عبد الرحيم بن سليمان المروزي ثم الكوفي- 66 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي- 67 أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي- 68 مروان بن معاوية أبو عبد الله الفزاري الكوفي- 69 حفص بن غياث أبو عمر النخعي الكوفي- 70 وكيع بن الجراح بن مليح- 71 عبيدة بن حميد الكوفي- 72 عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي- 73 عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي الكوفي- 74 عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي- 75 محمد بن فضيل الكوفي- 76 حماد بن أسامة الكوفي- 77 محمد بن بشر العبدي الكوفي- 78 يحيى بن سعيد القرشي الأموي الكوفي- 79 يونس بن بكير أبو بكر الشيباني الكوفي- 80 عبد الله بن نمير أبو هشام الهمداني ثم الكوفي- 81 شجاع بن الوليد أبو بدر الكوفي- 82 محمد بن عبيد أبو عبد الله الإيادي الكوفي- 83 عبد الله بن داود بن

عامر الخريبي الكوفي- 85 الحسين بن علي أبو علي الجعفي الكوفي- 85 زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي الكوفي- 86 عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي الكوفي- 87 إسحاق بن سليمان أبو يحيى الكوفي- 88 محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري الكوفي- 89 يحيى بن آدم أبو زكريا القرشي الكوفي- 90 داود بن يحيى بن يمان العجلي الكوفي- 91 عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ- 92 أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي- 93 قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي الكوفي- 94 موسى بن داود أبو عبد الله الضبي الكوفي- 95 خلف بن تميم أبو عبد الرحمن التميمي الكوفي- 96 يحيى بن أبي بكير أبو زكريا العبدي الكوفي- 97 عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي- ৯৮ زكريا بن عدي أبو يحيى التيمي الكوفي- 99 أحمد بن عبد الله بن يونس الحافظ أبو عبد الله اليربوعي الكوفي- 100 مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي- 101 خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني الكوفي- 102 يحي بن عبد الحميد 103 أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الكوفي 104 محمد بن عبد الله بن نمير عبد الرحمن الهمداني الكوفي- 105 عثمان بن أبي شيبة الكوفي- 106 علي بن محمد بن إسحاق أبو الحسن الطنافسي الكوفي- 107 أحمد بن حميد أبو الحسن الكوفي- 108 الحسن بن الربيع أبو علي البجلي الكوفي 109 محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفى- 110 هناد بن السرى شيخ الكوفي- رحمهم الله اجمعين.

বুখারী শরীফে কুফী রাবী

বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসসমূহের সবচেয়ে বেশি বর্ণনাকারী হচ্ছেন কুফার বর্ণনাকারী। তিনশ'রও বেশি বর্ণনাকারী হচ্ছেন কুফার অধিবাসী। তাছাড়া বুখারী শরীফে ২৯ জন সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে যারা বিভিন্ন সময়ে কুফায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তারা হচ্ছেন-

1 أَشْعَثُ بْنُ قيس الكندي رَضِيَ الله عَنْهُ 2 عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ 3 أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 4 عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُ 5 بُرَيْدَةَ بْنُ الحصيب رَضِيَ الله عَنْهُ 6 عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 7 جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 8 عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 9 جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ 10 عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ رَضِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 11

جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ 12 مِرْدَاسٍ بْنِ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 13 حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 14 الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 15 حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ 16 مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهُ 17 خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ الله عَنْهُ 18 مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 19 زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ 20 نُعْمَانُ بن بشير رَضِيَ الله عَنْهُ 21 سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 22 نُعْمَانُ بْنُ مقرن 23 سَمُرَةُ بْنُ جُنْادَة رَضِيَ الله عَنْهُ 24 نفيع بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ 25 أَبُو جَمِيلَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 26 وهبُ بْنُ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ 27 عَبْدُ الله ابْنُ أَبِي اوفي رَضِيَ الله عَنْهُ 28 عَبْدُ الله ابْنُ يزيد رَضِيَ الله عَنْهُ 29 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى رَضِيَ الله عَنْهُ

বুখারী শরীফে কুফী সনদ

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, গায়র মুকাল্লিদগণ কুফার আলিমগণ সম্পর্কে এত নেতিবাচক মতামত পোষণ করেন। অথচ اصح الكتب بعد كتاب الله কিতাবুল্লাহ'র পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফে ৮৫টি সনদ এমন আছে যার বর্ণনাকারী সকলেই কুফী। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-

1. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ.

উক্ত সনদে ৫ জন বর্ণনাকারী আছেন যাদের সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.) বলেন - إسناده كلهم كوفيون এই সনদের সকল বর্ণনাকারী কুফী। (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

2.حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ الله.

উক্ত সনদেও ৫ জন বর্ণনাকারী আছেন যাদের সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.)-এর মন্তব্য পূর্বানুরূপ। (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উক্ত হাদীসের সনদে বর্ণিত মোট ৫ জন বর্ণনাকারী সকলেই কুফী। (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

4 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى. ص 19

উক্ত হাদীসের সনদও পূর্বের ন্যায়। অর্থাৎ সকল বর্ণনাকারী একই এবং কুফী।

5 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى.

উপরোক্ত সনদের সকল বর্ণনাকারী কুফী। (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা)

6 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ.

উক্ত হাদীসের সনদে ৬ জন বর্ণনাকারী আছেন যাদের সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.)-এর মন্তব্য رواته كلهم ثقات كوفيون বর্ণনাকারী সকলেই সিকাহ (বিশ্বস্ত) ও কুফী। (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, ৭৩৪ পৃষ্ঠা)

7 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى . ص 32

উক্ত হাদীসের সনদ ৪নং সনদের অনুরূপ। সুতরাং বর্ণনাকারীগণ সকলেই কুফী।

8 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ.

আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত ৫ জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.)-এর মন্তব্য رواته كلهم كوفيون অর্থাৎ বর্ণনাকারী সকলেই কুফী। (উমদাতুল কারী প্রথম খণ্ড, ৮৫৬ পৃষ্ঠা)।

9 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. ص 56

উক্ত হাদীসের সনদে ছয়জন বর্ণনকারী আছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.) বলেন- رجال اسناده كلهم كوفيون এই সনদের সকল বর্ণনাকারী কুফী। (উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)

10 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ. ص 58

এই হাদীসের সনদেও ৬জন বর্ণনাকারী আছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লামা আইনী

(র.) বলেন-رواته كلهم كوفيون وأئمة أَجلاء وإسناده من أصح الأسانيد এই সনদের সকল বর্ণনাকারী কুফী এবং শ্রেষ্ঠ ইমামগণের অন্তর্গত। এই হাদীসের সনদ সর্বাধিক সহীহ সনদসমূহের একটি। (উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)

11 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى– ص 90

এই সনদও ৪নং ও ৭নং সনদের অনুরূপ। এরা সকলেই কুফী।

12 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ.

উক্ত হাদীসের সনদে ৫ জন বর্ণনাকারী আছেন। তার সকলেই কুফার অধিবাসী ছিলেন। (উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীসঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ.

উক্ত সনদের সর্বশেষ বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ছাড়া সকল বর্ণনাকারী কুফী।

এখানে কয়েকটি সনদ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হল। এভাবে অনুসন্ধানে সর্বমোট ৮৫টি সনদ পাওয়া গেছে যার বর্ণনাকারী সকলেই কুফী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি গায়র মুকাল্লিদগণের বিদ্বেষ ও ইমাম যাহাবীর বক্তব্য

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদের উস্তাদ। অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে কটুক্তি করেন। তাঁকে ইমাম বলার সৌজন্যতা পর্যন্ত দেখান না। অথচ হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র.) যাকে গায়র মুকাল্লিদীনগণ উসূলে হাদীসে আদর্শ বলে মনে করেন- তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

وكان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويكتب.

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন ইমাম, আল্লাহভীরু, আলিম, আমলকারী, ইবাদতকারী, মহান মর্যাদাশীল। রাজা বাদশাহদের কোন দান গ্রহণ করতেন না বরং নিজে ব্যবসা করতেন এবং লেখতেন। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা)।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, تذكرة الحفاظ গ্রন্থে হাফিযে হাদীস ছাড়া আর কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে আল্লামা যাহাবী (র.)-এর দৃষ্টিতে নিশ্চয় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন হাফিযে হাদীস। তা ছাড়া তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে তাবিঈও বলেছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যতম সংকলক ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁকে মহান ইমাম বলেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বিশ্বের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও ফকীহগণের উক্তি

১. হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৯৩-১৭৯ হিজরী)

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, আমি এমন এক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, যিনি ঘরের এই স্তম্ভকে (ইলমের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে) যুক্তি দ্বারা স্বর্ণের স্তম্ভে পরিণত করে দিতে পারেন। (তারীখে বাগদাদ, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩৩৮)।

২. ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৫০-২০৪ হিজরী)

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি ফিকহ এর ইলিম হাসিল করতে চায়, সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর ছাত্রদের সান্নিধ্য লাভ করে। কারণ, ফিকহ এর ব্যাপারে সকলেই ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুখাপেক্ষী।" (তারীখে বাগদাদ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

"যে ব্যক্তি আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব পড়বে না, ইলমে তার গভীরতা হবে না এবং জ্ঞানও তার অর্জিত হতে পারে না। আবূ হানীফার কথা এবং কাজ তাঁর ফিকহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (উকুদুল জিমান, পৃষ্ঠা-১৮৭)

"অন্যান্য সকল ফকীহ আলিমগণ ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ।" (তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা-৬৬)

৩. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেন, "আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি, যিনি আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে অধিক ফকীহ হতে পেরেছেন এবং তাঁর চেয়ে বেশি ভাল করে নামায পড়তে পেরেছেন"।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৬৪-২৪১ হিজরী)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তিনজন এমন ব্যক্তি আছেন, যারা কোন মাসআলায় একমত হয়ে গেলে, সেখানে আর ইখতিলাফ করার কোন সুযোগ থাকে না। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে সেই তিন ব্যক্তি? তখন তিনি জবাব দিলেন, "আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং (তার দুই বিশেষ ছাত্র) ইমাম আবূ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"। (আল-আনসাব লিস্ সামআনী, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২০৪)

ইব্রাহিম হারবী বলেন, "আমি একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সূক্ষ্ম মাসআলাসমূহের উত্তর আপনার কাছে কোথা থেকে আসলো? তিনি জবাব দিলেন, মুহাম্মদ ইবনে হাসান (ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব থেকে।" (তারীখে বাগদাদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৭)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইমাম আযমের ইন্তিকালের কয়েকদিন পর তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বাগদাদ পৌঁছলেন, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন "আবূ হানীফা, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেছেন, কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত (ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে) রেখে গেছেন। হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেছেন, তিনিও একজন স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন, কিন্তু আফসোস, সারা দুনিয়ার কেউ তোমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।" (উকূদুল জিমান)

৬. হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- "ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু সংবাদ শুনে ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রের সু-প্রসিদ্ধ ইমাম, শাফিঈ মাযহাবের প্রধানতম সংকলক হযরত ইবনে জরীহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আহ! ইলমের কি এক অফুরন্ত খনি আজ আমাদের হাতছাড়া হলো"। (তাহযীবুত্তাহযীব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫০)

৭. মক্কী বিন ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মক্কী বিন ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যতম উস্তাদ। 'তিন বর্ণনাকারী' বিশিষ্ট সনদের হাদীসগুলোর অধিকাংশই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এই মক্কী বিন ইব্রাহিম ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ছাত্রদের একজন। স্বীয় উস্তাদ আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন- 'তিনি তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠতম আলিম ছিলেন।" (তাহযীবের টীকা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫১)

"উল্লেখ্য, মুতাকাদ্দিমীন তথা প্রাচীনদের পরিভাষায় 'ইলম' মানেই হলো 'ইলমুল হাদীস'। সূতরাং উপরোক্ত স্বীকৃতি ইলমুল হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৮. ইমাম হযরত শু'বা বিন হাজ্জাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

সনদ পর্যালোচনা শাস্ত্রের প্রথম ইমাম হযরত শু'বা বিন হাজ্জাজকে গোটা ইসলামী উম্মাহ শ্রদ্ধাভরে 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' এর সম্মানজনক উপাধি উপহার দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো- 'আল্লাহর কসম! অতি উত্তম বোধ ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি"। ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হযরত শু'বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে অপরিসীম শূন্যতা অনুভব করেছিলেন তা প্রকাশ করেছেন এভাবে- "হায়! ইলমের এক উজ্জল আলোকবর্তিকা আজ কুফায় নিভে গেল। ইমাম আযমের মতো ব্যক্তির দেখা এরা আর পাবে না। (আল-খাইরাতুল হিসান, ইবনে হাজার লিখিত, পৃষ্ঠা-৩১)

৯. ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২০২-২৭৫ হিজরী)

ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-, "নিঃসন্দেহে আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম"। (তাহযীব, পৃষ্ঠা-৪৪৫)

১০. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

সনদ পর্যালোচনা শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন- আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আস্থাভাজন ছিলেন। পূর্ণ দায়িত্বের সাথেই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি আরোও বলেছেন- "হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আস্থাভাজন ছিলেন। এছাড়া ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে দাউদ আল কাত্তানের এ স্বীকৃতিবাক্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "তাঁর (ইমাম আবূ হানীফার) অধিকাংশ মতামত

আমি অনুসরণ করেছি"। (তাযকিরাতুল হুফফায, ইমাম যাহাবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-১১০)

একবার হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনকে প্রশ্ন করা হলো- হাদীসশাস্ত্রে আবূ হানীফা কি আস্থাভাজন ব্যক্তি? সম্ভবতঃ প্রচ্ছন্ন সংশয় আঁচ করতে পেরে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি আস্থাভাজন, অবশ্যই তিনি আস্থাভাজন। (মানাকিবুল ইমাম আল আ'যাম লিলমাওয়াফিক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯২)

১১. আল্লামা ঈসা ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আল্লামা ঈসা ইবনে মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খলীফা মনসুরকে বলেছেন, "ইনি (ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম।

১২. আল্লামা সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আল্লামা সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, লোক ফিকহ শাস্ত্রে নিদ্রিত ছিল, ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে সকলকে জাগ্রত করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে গবেষক আলিমগণের মতামত ও মন্তব্য বিস্তৃত আকারে তুলে ধরতে গেলে শুধু এ বিষয়েই এক বৃহৎ সংকলনের প্রয়োজন হবে। এমনকি কেবল হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মহান অবদান প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত আরবী ও উর্দূতে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। (ইমাম আবূ হানীফা আওর ইলমে হাদীস, কৃত মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দলবী)

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলছি- ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসশস্ত্রে তাঁর সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার' এমন এক সময় প্রণয়ন করেন, যখন হাদীসশাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোরও (যেমন- মুআত্তা ইমাম মালিক, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ও মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা) অস্তিত্ব ছিলো না। প্রায় ৪০হাজার সংগৃহীত হাদীস থেকে চয়ন করে এ গ্রন্থটি (কিতাবুল আছার) তিনি সংকলন করেন। (মানাকিবুল ইমামুল আল আযাম লিলমাওয়াফিক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৫)

ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদ বেশিরভাগ ইরাকী, কুফী ও বসরী

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর অনন্য সংকলন বুখারী শরীফে ৩১০ জনের মতো উস্তাদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যাদের মধ্যে প্রায় পৌনে দু'শ উস্তাদ হচ্ছেন ইরাকী। তন্মধ্যে ৪৫ জন কুফী, ৮৫ জন বসরী এবং বাকীরা অন্যান্য শহরের।

পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট কুফার

মুহাদ্দিসগণের কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁদেরকে কি পরিমাণ গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন, যার ফলে তিনি অসংখ্যবার কুফা সফর করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস চর্চা করে (পবিত্র কুরআনের পর) সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেন।

ইমাম বুখারী (র.)-এর কয়েকজন উস্তাদ যারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র

ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদগণের মধ্যে এমন অনেক বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন যারা ছিলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র। তাদের কয়েকজন হলেন-

1 امام احمد بن حنبل رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

2 سعيد بن ابو ربيع ابو زيد الهروي رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

3 ضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل رحمه الله تلميذ امام ابو حنيفة رحمه الله

4 عباس بن وليد رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

5 عبد الله بن يزيد العدوي البصري المكي ابو عبد الرحمن المقري رحمه الله تلميذ امام ابو حنيفة رحمه الله

6 عبيد الله بن موسى الكوفي رحمه الله تلميذ امام ابو حنيفة رحمه الله

7 علي بن جعد الجوهري رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

8 علي بن حجر المروزي رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

9 علي بن المديني رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

10 فضل بن عمرو بن دكين ابو نعيم الكوفي رحمه الله تلميذ امام ابو حنيفة رحمه الله

11 محمد بن صباح الدولابي البغدادي رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

12 محمد بن عبد الله بن المثني الانصاري رحمه الله تلميذ امام ابو حنيفة رحمه الله

13 محمد بن عمرو بن جبلة العتكي البصري رحمه الله تلميذ امام محمد رحمه الله

14 محمد بن مقاتل ابو الحسن المروزي رحمه الله تلميذ امام محمد رحمه الله

15 مكي ابن ابراهيم البلخي رحمه الله تلميذ امام ابو حنيفة رحمه الله

16 هشام بن عبد المالك باهلي ابو الوليد الطياليسي البصري رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

17 هشيم بن خارجة رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله

18 يحي بن صالح الوحاظي ابو زكريا الشامي رحمه الله تلميذ امام محمد رحمه الله

19 يحي بن معين رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف وامام ابو محمد رحمهما الله

20 يحي بن يحي بن بكير بن عبد الرحمن النيسابوري رحمه الله تلميذ قاضي ابو يوسف رحمه الله.

বুখারী শরীফে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সনদে হাদীস না থাকা

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসের জ্ঞান ছিল না তা প্রমাণ করার জন্য গায়র মুকাল্লিদগণ বলে থাকেন, ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সনদে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

এর জবাবে বলা যায়, কারো সনদে কোন হাদীস বর্ণনা না করার অর্থ এই নয় যে, তার হাদীসের জ্ঞান কম ছিল। কারণ কেবলমাত্র ইমাম বুখারী (র.) নয়, ইমাম মুসলিম (র.) ও বুখারী (র.) দুজনের কেউই তাঁদের সহীহ গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র.) হতে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। তাহলে কি ইমাম শাফিঈ (র.) অনির্ভরযোগ্য ছিলেন? অথচ ইমাম বুখারী (র.) শাফিঈ মতাবলম্বী বা ঐ মতের প্রতি মায়িল ছিলেন।

তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজে বলেন, আমি শেষ আট বার বাগদাদ গেলাম। প্রত্যেক বার আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর মজলিসে বসলাম। (سير أعلام النبلاء খণ্ড ১২, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

অথচ পূর্ণ বুখারী শরীফে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর সনদে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তা হলে কি ইমাম বুখারী (র.)-এর দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ (র.) সিকাহ মুহাদ্দিস ছিলেন না? যদি তাই হয় তাহলে তিনি কেন আটবার ইমাম আহমদ (র.) এর কাছে হাদীস শিক্ষার জন্য গেলেন?

শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (র.) নন, এরকম আরও অনেক হাদীসের ইমাম আছেন যারা উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস অর্জন করেছেন কিন্তু স্বীয় কিতাবে তাঁদের সনদে হাদীস বর্ণনা করেননি। যেমন ইমাম মুসলিম (র.) ছিলেন ইমাম বুখারী (র.)-এর ছাত্র। তিনি ইমাম বুখারী (র.) সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা রাখতেন।

একদা ইমাম বুখারী (র.)-এর খেদমতে গেলে তিনি তাঁকে (ইমাম বুখারী) বলেন–

دعني اقبل رجليك يا استاذ الاساتذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله.(البداية والنهاية– ج 1 ص 34)

–হে উস্তাযুল আসাতিযা, মুহাদ্দিসগণের সরদার ও অসুস্থ অবস্থায় হাদীসের চিকিৎসক! আমাকে আপনার পদদ্বয় চুম্বন করার সুযোগ দিন।

অথচ ইমাম মুসলিম (র.) **الصحيح لمسلم** গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র.)-এর সনদে একটি হাদীসও বর্ণনা করেননি।

চতুর্থ অধ্যায়
ইমাম বুখারী (র.)-এর সাথে গায়র মুকাল্লিদগণের মত পার্থক্য

ইমাম বুখারী (র.)-এর মসলক

গায়র মুকাল্লিদগণ নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে বুখারী শরীফ ও ইমাম বুখারী (র.)-এর দোহাই দিয়ে থাকেন। সর্বক্ষেত্রে তারা বুখারী শরীফের হাদীস থেকে দলীল তলব করেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা ইমাম বুখারী (র.)-এর তাকলীদ করছেন।

লা-মাযহাবীরা নিজেদেরকে কোন ইমামের অনুসারী ভাবতে নারাজ। আবার হাদীসের ক্ষেত্রে তারা ইমাম বুখারী (র.)-এর দোহাই দিয়ে থাকেন। তারা যে ইমাম বুখারী (র.)-এর দোহাই দেন তিনি নিজেও কোন ইমামের অনুসারী ছিলেন। এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লামা আবূ হাসিম আব্বাদী, ইমাম তাজ উদ্দীন সবকী, শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, নবাব সিদ্দিক হাসান খান (গায়র মুকাল্লিদগণের ইমাম) প্রমূখের মতে ইমাম বুখারী (র.) শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অপরদিকে ইবনে আবূ ইয়ালা, ইবনে তায়মিয়া (গায়র মুকাল্লিদদের শ্রদ্ধাভাজন), ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী প্রমুখের মতে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবুকী (র.) **طبقات الشافعية** গ্রন্থে উদ্ধৃত ইমাম বুখারী (র.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

ذكر أبو عاصم العبادى أبا عبد الله فى كتابه الطبقات وقال سمع من الزعفرانى وأبى ثور والكرابيسى قلت وتفقه على الحميدى وكلهم من أصحاب الشافعى. (طبقات الشافعية الكبري– ج 2 ص 614)

অর্থাৎ আবূ আসিম আব্বাদী **طبقات الشافعية** গ্রন্থে আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী (র.) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন- তিনি যা'ফরানী ও আবূ সাওর কারাবিছী এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করেছেন। আমি (তাজ উদ্দীন সুবুকী) বলি, তিনি হুমায়দী

(র.)-এর নিকট থেকে ফিক্হ শিখেছেন। আর তারা সকলেই ছিলেন শাফিঈ মতাবলম্বী।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন-

ومن هذا القبيل محمد بن إسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعية وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال إنه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشافعي واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخاري في الشافعية بذكره في طبقاتهم وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له

অর্থাৎ এদিক থেকে ইমাম বুখারী (র.)ও শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন। যেহেতু তাঁকে **طبقات الشافعية** এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর **طبقات الشافعية** এ যারা তাঁকে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে একজন হলেন তাজ উদ্দীন সবকী। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (র.) হুমায়দী (র.) এর নিকট থেকে ফিক্হ এর জ্ঞান লাভ করেছেন। আর হুমায়দী (র.) ফিক্হ শিখেছেন হযরত শাফিঈ (র.)-এর নিকট থেকে। আমাদের শায়খ ইমাম বুখারী (র.)-কে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দলীল প্রদান করেছেন যে, তাঁকে **طبقات الشافعية** এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইমাম নববী (র.) এর উক্তিও এ কথার প্রমাণ বহন করে। **(الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف)**

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের বক্তব্য

গায়র মুকালিদগনের ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান সাহেব স্বীয় গ্রন্থে হানাফী ইমামদের বর্ণনার পর লেখেন:

فلنذكر نبذأ من ائمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين– وهؤلاء صنفان احدهما من تشرف من صحبة الامام الشافعي والاخر من تلاهم من الائمة الاول– فمنهم احمد خالد الخلال– واما الصنف الثاني محمد بن ادريس ابو حاطم الرازي ومحمد بن اسماعيل البخاري–

অর্থাৎ এখন আমি শাফিঈ ইমামদের আলোচনা করব যাতে আমার পুস্তকটি দুই দিক থেকে পরিপূর্ণ ও জামে’ হতে পারে। শাফিঈ ইমামগণ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ যারা সরাসরি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সঙ্গ লাভ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগ যারা পরবর্তীতে প্রথম ভাগের ইমামগণের অনুসরণ করেছেন। প্রথম ভাগের ইমামদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আহমদ খালিদ আল খাল্লাল। আর দ্বিতীয়

ভাগের ইমামগণের মধ্যে আছেন মুহাম্মদ বিন ইদরীস আবু হাতিম আর রাযী ও মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী। (ابجد العلوم তৃতীয় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)

নওয়াব সাহেব অন্য এক স্থানে লেখেন:

قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان البخاري امام المسلمين وقدوة المؤمنين شيخ الموحدين والمغول عليه في احاديث سيد المرسلين قال وقد ذكره ابو عاصم قي الطبقات الشافعية.

শায়খ তাজ উদ্দীন সবকী (র.) **طبقات الشافعية** গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী (র.) ছিলেন মুসলমানদের ইমাম, মুমিনদের অনুসৃত, আহলে তাওহীদ এর শায়খ, সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। আবূ আসিম (র.) তাঁকে শাফিঈ মতাবলম্বীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (**المحطة في ذكر الصحاح الستة**, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

নওয়াব সাহেবের উপরোক্ত উক্তি হতে পরিস্কার প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন। কারণ প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি নিজে তা দাবি করেছেন আর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি তাজ উদ্দীন সবকী (র.)-এর উক্তি উল্লেখ করে তার উপর নিরব রয়েছেন। কোন মন্তব্য করেননি।

কাযী আবূল হুসাইন মুহাম্মদ বিন আবূ ইয়ালা হাম্বলী (র.) **طبقات الحنابلة** গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র.)-এর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যার থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (**طبقات الحنابلة ১ম খণ্ড** ২৭১ পৃষ্ঠা)।

হাফিয ইবনে তায়মিয়ার বক্তব্য

হাফিয ইবনে তায়মিয়া বলেন,

وأئمة الحديث كالبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما.

–হাদীসের ইমামগণ যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী (র.) প্রমুখ ইমামগণও তাদের দুজনের (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইসহাক বিন রাহবিয়াহ (র.)-এর) অনুসারী ছিলেন। তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেছেন। (ফতওয়ায়ে ইবনে তায়মিয়া- ২৫ খণ্ড ২৩২ পৃষ্ঠা)

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযীর মন্তব্য

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী বলেন-

وكذلك البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه.

অর্থাৎ এমনিভাবে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও আসরাম। ইহা হচ্ছে ইমাম আহমদ (র.)-এর অনুসারীদের স্তর। তাঁরা তাকে অনুসরণ করেছেন। তারা কেবল মুকাল্লিদ ছিলেন এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রতি তাঁদেরকে নিসবত করা হয়। **اعلام** (**الموقعين** ২য় খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

ইবনে তায়মিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিমের বর্ণনা থেকে বুঝা যয় যে, ইমাম বুখারী (র.) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

মোট কথা, তিনি শাফিঈ মতাবলম্বী হোন আর হাম্বলী হোন উপরের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি ছিলেন মুকাল্লিদ তথা কোনো ইমামের অনুসারী।

কেউ কেউ বলে থাকেন তিনি ছিলেন মুজতাহিদ। তাঁর ইজতিহাদের ফলাফল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) এর মাযহাবের সাথে মিলে যেত। কিন্ত নিম্নের আলোচনা থেকে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না।

ইবনে হাজার শাফিঈ বলেন -

أَنَّ الْبُخَارِيّ فِي جَمِيع مَا يُورِدهُ مِنْ تَفْسِير الْغَرِيب إِنَّمَا يَنْقُلهُ عَنْ أَهْل ذَلِكَ الْفَنّ كَأَبِي عُبَيْدَة وَالنَّضْر بْن شُمَيْلٍ وَالْفَرَّاء وَغَيْرهمْ ، وَأَمَّا الْمَبَاحِث الْفِقْهِيَّة فَغَالِبهَا مُسْتَمَدَّة لَهُ مِنْ الشَّافِعِيّ وَأَبِي عُبَيْدَة وَأَمْثَالهمَا ، وَأَمَّا الْمَسَائِل الْكَلَامِيَّة فَأَكْثَرهَا مِنْ الْكَرَابِيسِيّ وَابْن كِلَاب وَنَحْوهمَا .

অর্থাৎ ইমাম বুখারী হাদীস শরীফে আগত গরীব শব্দ সমূহের তাফসীর ঐ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ যেমন আবূ উবায়দা, নদর বিন শুমাইল, ফাররা প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে বিবৃত করতেন। অপরদিকে ফিকহী আলোচনায় ইমাম শাফিঈ (র.), আবূ উবাইদ প্রমুখ ফকীহ এর মতামত গ্রহণ করতেন এবং কালাম শাস্ত্রের বিষয়াবলীতে কারাবিসী ও ইবনে কিলাব প্রমুখের বর্ণনা গ্রহণ করতেন। (ফতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)

আল্লামা ইবনে হাজার এর আলোচ্য উক্তি থেকে একথা স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী (র.) ফিকহী আলোচনাসমূহে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ উবায়দা (র.)-এর

উক্তি গ্রহণ করতেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, তিনি মুজতাহিদে মুতলক ছিলেন না। কারণ স্বতন্ত্র কোন মুজতাহিদ ফিকহী বিষয়ে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন না এবং অন্যের মতামত নকলও করেন না।

দ্বিতীয়ত: যদি ইমাম বুখারী (র.) স্বতন্ত্র মুজতাহিদ হতেন তবে **طبقات الفقهاء** এর মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখিত হত। কিন্তু **طبقات الفقهاء** বিষয়ে লিখিত কোন গ্রন্থে তাঁর নাম নেই। আবূ ইসহাক শিরাজী শাফিঈ (র.) স্বীয় গ্রন্থেও ইমাম বুখারী (র.)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

তৃতীয়ত: মুজতাহিতগণের এক একটি ইজতিহাদী নীতিমালা থাকে, যার আলোকে তিনি ইজতিহাদ করেন। অথচ ইমাম বুখারী (র.)-এর নিজস্ব কোন নীতিমালা পাওয়া যায় না।

চতুর্থত: যদি ইমাম বুখারী (র.) একজন স্বতন্ত্র মুজতাহিদ হতেন, তাহলে ফিকহ এর কিতাবসমূহে যেখানে অন্যান্য মুজতাহিদগণের মতামত উল্লেখ করা হয় সেখানে বুখারী (র.) এরও স্বতন্ত্র মত উল্লেখ থাকত। অথচ ফিকহের কিতাবসমূহ তাঁর ফিকহী মতামত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইমাম বুখারী (র.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীস সহীহ হওয়া কিংবা দুর্বল হওয়া, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হওয়া অথবা দুর্বল হওয়ার বিষয়ে ইমাম বুখারী (র.)-এর মতামত উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিরমিযী শরীফের কোথাও ফিকহী কোন আলোচনায় ইমাম বুখারী (র.)-এর মতামত উল্লেখ করেননি। অথচ তিনি বড় বড় মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত ছাড়াও ইমাম বুখারী (র.) থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন ফুকাহায়ে কিরামের উক্তি ও মাযহাব তাঁর উক্ত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। একথা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) স্বতন্ত্র কোন মুজতাহিদ ছিলেন না।

হ্যাঁ, তিনি **مجتهد منتسب** ছিলেন। আর তাতে কোন সমস্যাও নেই, কারণ ঐ প্রকারের মুজতাহিদগণ নিজেরা মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও উসূলে ইজতিহাদে নিজেদের ইমামের মুকাল্লিদ বা অনুসারী। যেমনিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) দুজনই মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারী।

হযরত মাওলানা সরফরাজ খান সাহেব এ প্রসঙ্গে বলেন- মোট কথা আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) শাফিঈ মাযহাব অনুসারী ছিলেন। স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন না। আর এ অর্থে তিনি শাফিঈ

ছিলেন না যে, তাঁর ইজতিহাদের ফলাফল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সাথে মিলে গিয়েছিল। বরং তিনি ব্যাপকার্থে শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন।

পাঠকবৃন্দ, উপরোল্লেখিত বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা মতামত অনুযায়ী প্রমাণিত হল যে, ইমাম বুখারী (র.) নিজে মুকাল্লিদ ছিলেন, ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে তিনি স্বীয় ইমামের তাকলীদ করতেন। তাকলীদের বিপরীত তিনি কোন মত পোষন করেননি। কোন স্থানেই তিনি তাকলীদকে মন্দ বলেননি। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.)-এর মহব্বতের দাবিদার গায়র মুকাল্লিদগণ তাকলীদের এত বিরোধী যে, ইহুদী নাসারাদের অন্ধ অনুসরনের বিরুদ্ধে নাযিলকৃত কুরআন করীমের আয়াতসমূহকে মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদের শানে ব্যবহার করে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ) খারিজীদের অভ্যাসও অনুরূপ ছিল। তাদের সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ ইবনে উমর (রা.) তাদের (খারিজীদের) নিকৃষ্টতম জীব বলে মনে করতেন। তারা কাফিরদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে মুমিনদের শানে ব্যবহার করত। (বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২৪)

তাকলীদ সম্পর্কে গায়র মুকাল্লিদদের ভিত্তিহীন মন্তব্য

তাকলীদ সম্পর্কে গায়র মুকাল্লিদগণ যা বলে থাকেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাদের চিন্তাধারা অনুধাবনের জন্য তাদের কিছু বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

মাওলানা আব্দুল আজিজ মুলতানী লিখেছেন- সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের চারশ' বছর পর্যন্ত ইসলাম তাকলীদের আপদ হতে পাক পবিত্র ছিল (**استيصال التقليد ص 9**)

তিনি আরো লিখেছেন- তাকলীদের ব্যাপারটি উম্মতের জন্য একটি পুরাতন রোগ। এটিই পূর্ববর্তী জাতিকে নবীগণের অনুসরণ থেকে হটিয়ে ধ্বংস করে।

তিনি উক্ত পুস্তকের এক স্থানে লেখেন সুতরাং বিদআতের যে সকল কারণ রয়েছে তা পুরোপুরি তাকলীদী মাযহাবে বিদ্যমান। তাই তাকলীদ বিদআত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, বরং এগুলো হচ্ছে সকল মন্দ ও ভ্রষ্টতার মূল। (**استيصال التقليد ص 9**)

সাপ্তাহিক الاعتصام। এর সাবেক সম্পাদক সালাহ উদ্দীন ইউসুফ সাহেব লেখেন, 'রইল এ কথা যে, তাকলীদ বিদআত ও ভ্রষ্টতা কি না? এ ক্ষেত্রে আমি পূর্ণ দৃষ্টিতে বলছি যে, তাকলীদ কোন কোন ক্ষেত্রে শিরক পর্যন্ত হয়ে যায়, আর বিদআত তো সর্বক্ষেত্রেই। (استيصال التقليد ص 2)

বশীরুর রহমান গওহর আফসানী বলেন, তাকলীদ যেহেতু মুর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, অদুরদর্শিতা ও অক্ষমতা সেহেতু এটি দীন ও ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। তাকলীদের উপস্থিতিতে মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তাকলীদ ইহ-পরকালের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য। (ضرب شديد علي اهل التقليد ص 6)

তিনি আরও বলেন, ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা, যা মুসলমানদের উপর আপতিত হয়েছে তা হল কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং তাকলীদের উপর নির্ভর করা। সর্বোত্তম যুগসমূহে এমনকি চার ইমামের যুগ পর্যন্ত তাকলীদী ফিতনা অনুপস্থিত ছিল। ইসলামে যখন আজমীদের প্রভাব পড়ল তখন থেকেই ইসলামে নতুন নতুন ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তাকলীদ অনুরূপ এক ফিতনা। (ضرب شديد علي اهل التقليد ص 12)

তিনি এক স্থানে এরূপ মন্তব্যও করেন যে, তাকলীদ ইসলাম গ্রহণের পথে এক বাধা। তিনি আরও লেখেন- তাকলীদ ইসলামের যত ক্ষতি করেছে সম্ভবত: আর কোন কিছুই ইসলামের তত ক্ষতি করেনি।

গায়র মুকল্লিদগণের আরেক বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আব্দুশ শাকুর লেখেন- বিশেষ ব্যক্তিবর্গতো জানেন, সাধারণ লোকদের অবগতির জন্য বলছি যে, মুকাল্লিদগণ দশটি কারণে পথভ্রষ্ট ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলসমূহের বাইরে। এদের সাথে বিয়ে শাদী জায়িয নয়। প্রথম কারণ বর্তমান হানাফীদের মধ্যে ব্যক্তিতাকলীদ বিদ্যমান, যা সচরাচর হারাম ও নাজায়িয। (سياحة الجنان ص 5)

নবীগণের শিক্ষা যে সকল লোক গ্রহণ করেনি তারাই মুকাল্লিদ ছিল। আল্লাহর হকে সবচেয়ে বেশি ধোকা দানকারী বস্তু হল তাকলীদ। (طريق محمد ص 23)

উক্ত কিতাবের অন্য স্থানে আছে- 'মোট কথা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যকে দূরে সরিয়ে দেয়ার এক যন্ত্র হলো তাকলীদ, যা রাসূলবিরোধীরা করত। এটি এমন একটি বস্তু যা ইসলামের মূলনীতি থেকে দুনিয়াকে রুখে দেয়। (طريق محمد ص 25)

নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন- তাকলীদকে আবশ্যক করা বিদআতকে আবশ্যক করার নামান্তর। (النهج المقبول ص 2)

নওয়াব ওহীদুজ্জামান লেখেন-

من اهل البدعة الاحناف والشوافع الجامدون علي التقليد التاركون لكتاب الله وسنة رسوله– (هدية المهدي– ج 1 ص 121)

অর্থাৎ হানাফী ও শাফিঈগণ হচ্ছে আহলে বিদআত। যারা তাকলীদের উপর উড্ডয়মান এবং কুরআন সুন্নাহকে পরিত্যাগকারী।

গায়র মুকাল্লিদগণের কয়েকটি কিতাব হতে তাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল। এর চেয়ে আরও মারাত্মক শব্দাবলী তাদের কিতাবসমূহে রয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা এখানে উল্লেখ করা হল না।

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে দেখা গেল যে, বড় বড় আকাবীর উলামায়ে কিরাম এমনকি খোদ গায়র মুকাল্লিদগণের মুজাদ্দিদ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব হযরত ইমাম বুখারী (র.)-কে শাফিঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে তাকলীদ করা আবশ্যক। অথচ লা-মাযহাবীরা তাকলীদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করছে।

সহীহ বুখারী'র ভিত্তি তাকলীদের উপর

যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা হয় তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর লিখিত বুখারী শরীফই তাকলীদের উপর নির্ভরশীল। কারণ ইমাম বুখারী (র.) তার উস্তাদের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেই হাদীস গ্রহণ করতেন। তার উস্তাদ তার উস্তাদের উপর। এমনিভাবে নির্ভরশীলতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর কারো উপর নির্ভর করে বিনা বাক্য ব্যয়ে দলীল হিসাবে তার কথা গ্রহণ করে নেয়াই হল তাকলীদ। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করেছেন। এর সত্যাসত্যের ব্যাপারে তার কাছ থেকে কোন দলীল তলব করেননি। প্রমাণবিহীন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বলে মেনে নেন। এটি যদি তাকলীদ না হয় তাহলে তাকলীদ আর কি হবে? গায়র মুকাল্লিদগণ এমন কোন প্রমাণ দেখাননি যে, ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় উস্তাদের নিকট হতে হাদীসের বিশুদ্ধতার প্রমাণ তলব করেছেন। তেমনিভাবে তার কোন উস্তাদ তার উস্তাদের কাছে প্রমাণ তলব করেছেন এমন প্রমাণও তারা দেখাতে পারেননি। সুতরাং একথা প্রমাণিত যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর সকল রেওয়ায়তের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকলীদ। লা-মাযহাবীদের কাছে প্রশ্ন, তারা কি কোন রাবীর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি কোন হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পেয়েছেন?

ইমাম বুখারী (র.)-এর সাথে গায়র মুকাল্লিদগণের মত পার্থক্যের নমুনা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গায়র মুকাল্লিদগণ ইমাম বুখারী (র.) ও তাঁর কিতাবের প্রতি আস্থার দাবি করলেও ইমাম বুখারী (র.)-এর সাথে অনেক মাসআলায় তারা ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। অথচ সহীহ হাদীস উপস্থাপন করে ইমাম বুখারী (র.) তা প্রমাণ করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো। এগুলোর বেশিরভাগ বিশিষ্ট আলিমেদ্বীন হযরত মাওলানা আনোয়ার খুরশিদ লিখিত 'গায়র মুকাল্লিদীন : ইমাম বুখারী কি আদালত মে'' পুস্তকের**امام بخاري كي اجتهاد اور اب كي ذكر كرده احاديث جن پر غير مقلدين كا عمل نهي** অধ্যায় হতে সংগৃহীত।

১ম মাসআলা
ফিকহ ও ফকীহগণের মর্যাদা

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন এভাবে **بَاب مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ** । এ অধ্যায়ে তিনি হাদীস এনেছেন-

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ– (البخاري– ج 1 ص 16)

অর্থাৎ হুমায়দ বিন আব্দুর রহমান বলেন আমি হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে খুতবা দিতে শুনেছি, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে ফিকহ এর জ্ঞান দান করেন। নিশ্চয় আমি বন্টনকারী আর আল্লাহ দান করেন। এই উম্মত আল্লাহর দীনের উপর সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ তথা কিয়ামত পর্যন্ত কারো বিরোধিতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

উক্ত হাদীসে ফকীহগণের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ **تفَقُّهْهُ فِي الدِّينِ** ফকীহগণেরই হয়ে থাকে। আর ফকীহ তিনিই যিনি ফিক্‌হ এর জ্ঞান রাখেন।

অন্য হাদীসে আছে- النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا- অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে খনির ন্যায়। জাহিলিয়াতের যুগে যারা উত্তম ইসলামের যুগেও তারা উত্তম, যদি তারা ফিক্হের জ্ঞান লাভ করে। (১ম খণ্ড ৪৭৯)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী (র.) বলেন-

فَقُهُوا بضم القاف علي المشهور وحكي كسرها ما رووا فقهاء عالمين بالاحكام الشرعية الفقهية. (نووي– شرح مسلم– ج 2 ص 268)

অর্থাৎ فَقُهُوا শব্দের কাফ বর্ণে পেশ প্রসিদ্ধ। কোন বর্ণনায় যের দিয়েও পড়া যায়। অর্থ হলো, যখন তারা ফকীহ হবেন অর্থাৎ শরীআতের ফিকহী আহকামসমূহ অবগত হবেন।

বুখারী শরীফের এ বর্ণনা থেকেও ফিক্হ ও ফকীহগণের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

বুখারী শরীফের ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীস হলো:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল খালায় প্রবেশ করলেন। অর্থাৎ আমি তাঁর জন্য উযুর পানি ঠিক করে রাখলাম। তিনি বের হয়ে বললেন, এই পানি কে রেখেছে? তাঁকে এ বিষয়ে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তাঁকে আপনি দ্বীনী বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করুন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দীনের ফিকহী জ্ঞান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই তিনি খুশী হয়ে এ দু'আ করেছিলেন। বুখারী শরীফের এ বর্ণনা থেকে ও ফিক্হ ও ফকীহ এর মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

হযরত ইমাম বুখারী (র.)-এর অপর বর্ণনা:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُكَمَاءَ علماء فُقَهَاءَ– (البخاري– ج 1 ص 16)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা, প্রজ্ঞাশীল, জ্ঞানী ও ফকীহ হও।

অন্য এক হাদীসে হযরত উমর (রা.) বলেন- تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا- অর্থাৎ তোমাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে তোমরা ফিক্হ এর জ্ঞান অর্জন করে নাও। (বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত ওমর (রা.)-এর উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ফিকহ ও ফকীহগণের শান ও মর্যাদা প্রমাণিত হলো।

আর ইমাম বুখারী (র.) নিজের যবানীতেই উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষা জীবনেরর শুরুতেই তিনি হাদীসের সাথে সাথে ফিক্হ এর জ্ঞানও অর্জন করেন। ইমাম ওকী' ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত কিতাবসমূহ মুখস্থ করে নেন। তা ছাড়া বুখারী (র.) **جامع سفيان** শুনেছেন। এ কিতাবখানাও ফিকহ এর কিতাব। আল্লামা যাহাবী (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর উক্তি উল্লেখ করেন:

مَا جلَسْتُ لِلْحَدِيْثِ حَتَّى عرفْتُ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقِيمِ، وَحَتَّى نظرتُ فِي عَامَّةِ كُتُبِ الرَّأْيِ، وَحَتَّى دَخَلْتُ البَصْرَةَ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ نحوهَا، فَمَا تركتُ بِهَا حَدِيْثاً صَحِيْحاً إِلاَّ كَتَبْتُهُ، إِلاَّ مَا لَمْ يَظهر لِي.(سير أعلام النبلاء– ج 2 ص 614)

অর্থাৎ আমি দরসে হাদীসের মজলিস প্রতিষ্ঠা করিনি, যতক্ষণ না সহীহ ও সাকীম হাদীসকে পরিচয় করতে পেরেছি এবং যতক্ষণ না ফিকহ এর ব্যাপক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছি, আর আমি ৫ বার বসরায় গমন করে সেখানকার সকল সহীহ হাদীস লিখে নিয়েছি। তবে যা আমার কাছে প্রকাশ পায়নি তাছাড়া অর্থাৎ যে হাদীস পাইনি তা অন্য কথা। (سير أعلام النبلاء، ج 2 ص 614)

ইমাম বুখারী (র.)-এর উপরোক্ত উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরসে হাদীস এর মজলিস চালু করার জন্য হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান যেমন জরুরী যার দ্বারা সহীহ ও দুর্বল হাদীসকে আলাদা করা যায়। ঠিক তেমনিভাবে হাদীস থেকে মাসআলা বের করার জন্য ইলমে ফিকহ এর জ্ঞান অর্জন আবশ্যক।

ইমাম বুখারী (র.)-এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ যে, কাযী ওলীদ বিন ইবরাহীম (র.) বাল্যকালে হাদীস শিক্ষার জন্য ইমাম বুখারী (র.)-এর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে মুহাদ্দিসে কামিল হওয়ার যে সকল শর্তাবলী বর্ণনা করেন তা শুনে ওলীদ বিন ইবরাহীম (র.) বিচলিত হয়ে পড়েন। ইমাম বুখারী (র.) তা দেখে বলেন-

فإن لا تطق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن لا تحتاج إلا بعد الأسفار ووطي الديار وركوب البحار وهو مع ذا ثمرة الحديث وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة ولا عزة بأقل من عز المحدث. (تهذيب الكمال، ج 24 ص 474)

অর্থাৎ যদি তুমি ঐ কষ্টকর বিষয় পরিপূর্ণরূপে বহন করতে সক্ষম না হও,

তাহলে ফিক্হ শিক্ষা কর। কারণ তা তুমি বাড়িতে অবস্থান করেই শিখতে পারবে। যা শিখার জন্য তোমাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে না, বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে হবে না, সাগর পাড়ি দিতে হবে না। অথচ তা থেকে হাদীস শিক্ষার মর্যাদা লাভ করতে পারবে। ফকীহ্ এর সাওয়াব মুহাদ্দিসের সাওয়াব হতে কম নয়। পরকালে ফকীহর মর্যাদা মুহাদ্দিসের মর্যাদা থেকেও কম নয়। (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৪৭৪)

ইমাম বুখারী (র.)-এর আলোচ্য উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফিকহ্ শিক্ষা সহজ কাজ হলেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ ফিকহ্ হচ্ছে হাদীসের নির্যাস। হাদীস থেকেই শরীআতের আহকাম বের হয়। তাঁর বক্তব্য থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ফিক্হ শিক্ষা ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা না হলে তিনি সে জ্ঞান অর্জনের জন্য ওলীদ বিন ইবরাহীম (র.)-কে নির্দেশ দিতেন না।

অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ ইমাম বুখারী (র.)-এর চিন্তাধারার বিপরীত ফিকহ্ ও ফকীহ্ বিশেষ করে হানাফী ফকীহগণ সম্পর্কে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অপমানজনক শব্দাবলী ব্যবহার করেন যা পড়লে আশ্চর্য হতে হয়। ফিকহে হানাফীর বিরুদ্ধে গায়র মুকাল্লিদগণের কিছু মন্তব্য উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হল।

হাকীম ফয়জে আলম লিখেন- আমি বার বার এ কথাটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করি যে, আজ ফিকহে হানাফীর নামে যে সকল অনর্থক কথাবার্তার সংকলন হচ্ছে এবং পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তা মুসলমানদের একটি দলকে ভ্রষ্ট করা আবশ্যক করে দিচ্ছে। এগুলোর একটি শব্দও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। (اختلاف امت کا المیہ ص14)

তিনি আরো লিখেন: আমি একথা বলার অনুমতি চাচ্ছি যে, আজ ফিকহে হানাফীর নামে সংযোজিত যে সকল অনর্থক কথাবার্তা আমাদের সমাজে প্রচলিত ও প্রসারিত হচ্ছে এর একটি অক্ষরও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে ছাবিত নেই। আজ পর্যন্ত কেউ তা প্রমাণ করতেও পারেনি।

হাকীম সাহেবের মতো তার দলের আরও অনেকে এ দাবি করেন। অথচ তাদের এ দাবি সত্য নয়। তার মতের অসত্যতা প্রমাণের জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর **مسانيد** যেমন **مسانيد ابو حنيفة** ও **كتاب الآثار** যথেষ্ট। তা ছাড়া তাঁর ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করলেই দেখা যেতে পারে যে, হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহ ঐ সমস্ত কিতাবসমূহে আছে কি না?

গুরাবায়ে আহলে হাদীস (غرباء اهل حديث) জামাআতের সাবেক ইমাম মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব তার পিতা মাওলানা আব্দুল ওহাবের ইসলামী খিদমত সম্পর্কে বলেন, ... তিনি ইলম অর্জনের পর দিল্লীতে অবস্থান করে কুরআন হাদীসের দারস চালু করেন। অন্যান্য আকলী ও নকলী ইলমের পাশাপাশি তিনি মানতিক, দর্শন, প্রচলিত ফিকহ ইত্যাদি বিষেয়ের গোমর ফাঁস করে দেন এবং কুরআন-হাদীস থাকাবস্থায় ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখা বা আমল করাকে কঠিন পাপ বলে বর্ণনা করেন। (خطبة امارت– ص 13)

গায়র মুকাল্লিদগণের প্রখ্যাত বিতার্কিক তালেবুর রহমান সাহেব লিখেন: হানাফী ফিক্হ এমন সব নোংরা মাসআলায় ভরপুর যে, তা কলম দিয়ে লেখা এবং মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। কারণ এটা এমন ফিকহ যে, যখন তা মুস্তফা কামাল পাশার রাজ্যে প্রচলিত হয় তখনই তা তাদের পথ ভ্রষ্টতার কারণ হয় এবং এ সকল মাসআলা শুনেই তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নফরত সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ইসলামিয়া শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এই ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাব হেদায়ার কিছু মাসআলা সম্পর্কে মনে করেন যে, এটা যদি ইসলাম হয় তবে আমাদের জন্য সমাজতন্ত্র গ্রহণ করাই ভাল। (নাউযুবিল্লাহ) (اصلي حنفي نماز– ص 4)

গায়র মুকল্লিদগণের আরেক বিতার্কিক আবূল কালীম আশরাফ সালীম ফিকহে হানাফীর বিপরীত একটি পুস্তক লিখে তার শিরোনামের উপর লিখেন- ‘এই পুস্তকখানায় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক হাদীস এবং কুফী হানাফী ফিক্হ এর ভিত্তিহীন ও লজ্জাজনক মাসআলাসমূহের ইলমী ব্যাখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।’ (নাউযুবিল্লাহ)

২য় মাসআলা

পেশাব-পায়খানার সময় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলার দিকে পিঠ করে বসা নিষিদ্ধ

ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় কিতাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا– (بخاري– ج 1 ص 26)

অর্থাৎ- হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব পায়খানা করতে আসে তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে বা কিবলার দিকে পিঠ না দেয়। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হও। (বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)
এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন- 'কা'বা শরীফের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কাযায়ে হাজতের সময় কা'বার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসা হারাম। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের বেলায় এরূপ কোন বিধান নেই। এই মাসআলায় বিশুদ্ধ মাযহাব হলো খোলা মাঠে অথবা ঘরের ভিতর পেশাব পায়খানার বেলায় কোন পার্থক্য নেই। সব স্থানেই তা হারাম। এ ব্যাপারে আমি অন্যত্র দশটিরও বেশি দলীল উল্লেখ করেছি।'

কিন্তু উক্ত সহীহ, সরীহ, মারফূ, কাওলী হাদীসের বিপরীতে গায়র মুকাল্লিদগণের উক্তি হলো- পেশাব পায়খানার সময় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলার দিকে পিঠ করে বসা সম্পূর্ণ জায়িয। না জায়িয হওয়াতো দূরের কথা, মাকরূহও নয়। বরং সুন্নাত। (**نعوذ بالله**)
যেমন ইউনুস কুরাইশ সাহেব লিখেছেন: ঘরে অথবা কোন কিছুর আড়ালে কিবলাহমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা জায়িয। (**دستور المتقي– ص45**)
মাওলানা ওহীদুজ্জামান লিখেছেন- ইস্তিঞ্জার সময় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলার দিকে পেছন ফেরে বসা মাকরূহ নয়। (**نزل الابرار ص53**)
মুফতী রশিদ আহমদ সাহেব লিখেছেন- ইস্তিঞ্জার সময় কিবলামুখী হওয়া কিবলার দিকে পেছন ফেরা জায়িয কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আহলে হাদীসগণের কাজ হলো মাযহাবের বিরোধিতা করা। এজন্য করাচীতে তাঁরা মসজিদসমূহের ইস্তিঞ্জাখানা কিবলামুখী করে তৈরী করেছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেয়, এটি একটি সুন্নত, যা ১৪শ বছর ধরে মৃত ছিল। আমরা তা পুনর্জীবিত করেছি। (**احسن الفتاوي– ج3 ص109**)

৩য় মাসআলা
ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে বীর্য নাপাক

ইমাম বুখারী (র.) একটি অধ্যায় এনেছেন:

بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

'যখন কেউ বীর্য বা অন্য কোন নাপাকী ধৌত করে কিন্তু তার চিহ্ন বিলীন না হয়।'

এ প্রসঙ্গে ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন- ইমাম বুখারী (র.)-এর আলোচ্য অধ্যায় থেকে বুঝা যায় যে তাঁর মতে বীর্য নাপাক। (تيسير الباري– ج1 ص70)
কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণের মতামত হল মনী পাক। যেমন ওহীদুজ্জামান সাহেব তার নিজের মতামত উল্লেখ করেন এভাবে:

والمني طاهر سواء كان رطبا او يابسا مغلظا او غير مغلظ– (كنز الحقائق– ص6)

মনী পবিত্র তা আর্দ্র হউক বা শুষ্ক হউক, গাঢ় হউক বা হালকা হউক। (কানযুল হাকাইক, পৃষ্ঠা-৬)
নওয়াব নুরুল হাসান সাহেব লেখেন- 'মনী সর্বাবস্থায় পাক'। (আরফুল জাবী, পৃষ্ঠা-১০)
নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব বলেন, মানুষের বীর্য নাপাক হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। (بدور الاهلة– ص15)

৪র্থ মাসআলা

বদ্ধ পানিতে নাজাসাত পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যায়

বুখারী শরীফের আরেকটি অধ্যায় হল- بَاب البول فى الْمَاءِ الدَّائِمِ অর্থাৎ স্থির পানিতে প্রস্রাব করা। এ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র.) হাদীস এনেছেন-

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ– (ج1 ص 37)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, এরপর তাতে আবার গোসল করবে।
এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বদ্ধ পানিতে নাজাসাত পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যায়। এতে পানির বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তন হোক বা নাই হোক। এরূপ পানিতে উযু করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে গায়র মুকাল্লিদগণের মতামত হল পানির তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানি অপবিত্র হয় না। পানি কম হোক বা বেশি হোক।
এ প্রসঙ্গে গায়র মুকাল্লিদ নওয়াব নুরুল হাসান খান বলেন- 'বৃষ্টি, নদী বা কুয়ার পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী। যদি তাতে কোন নাজাসাত পতিত হয় এবং তার রং, গন্ধ বা স্বাদের কোন একটি পরিবর্তন না করে তাহলে তা পবিত্র থাকবে।' (عرف الجاوي– ص9)

নওয়াব ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন:

لا يفسد ماء البشر ولو كان صغيرا والماء فيه قليلا بوقوع نجاسة او موت حيوان دموي او غير دموي ولو انتقخ او تفسخ او تمعط بشرط ان لا يتغير احد اوصافه– (نزل الابرار– ج1 ص31)

অর্থাৎ কুপ ছোট হলেও তাতে নাজাসাত পতিত হওয়ার কারণে অথবা কোন প্রবাহমান রক্ত বিশিষ্ট বা প্রবাহমান নয় এমন রক্ত বিশিষ্ট কোন প্রাণী যদি তাতে পড়ে মারা যায় বা ফুলে যায় অথবা যদি তার শরীর ফেটে যায় এমনকি যদি পশমও ঝরে যায় তবুও সেই কুপের পানি নাপাক হবে না যতক্ষণ না পানির কোন একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না হবে। (নুযুলুল আবরার, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

৫ম মাসআলা

উযুর মধ্যে মাওয়ালাত আবশ্যক নয়

ইমাম বুখারী (র.) এর মতে উযুর অঙ্গসমূহ একের পর এক দ্রুত ধৌত করা আবশ্যক নয়। তিনি বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় লেখেন-

بَاب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ

'গোসল ও উযুর অঙ্গসমূহ ধৌত কালে দেরী করার অধ্যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উযুর অন্যান্য অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যাওয়ার পর পা ধৌত করেন।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)
এ অধ্যায়ের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস এনেছেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মায়মুনা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য কিছু পানি রাখলাম যার দ্বারা তিনি গোসল করলেন। তিনি তাঁর হাতে কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে দুই হাত দুই বার করে অথবা তিনবার করে ধৌত করলেন। এরপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তা দিয়ে লজ্জাস্থান

ধৌত করলেন। এরপর মাটিতে ঘষে হাত পরিস্কার করলেন। অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, দুই হাত ধৌত করলেন এবং তিনবার মাথা ধৌত করলেন। এরপর শরীরের উপর পানি ঢাললেন। অতঃপর সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং দু'পা ধৌত করলেন।

ইমাম বুখারী (র.)-এর রচিত উক্ত অধ্যায় এবং উল্লেখিত মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে এক অঙ্গের সাথে সাথে অন্য অঙ্গ ধৌত করা আবশ্যক নয়।

মাওলানা ওহীদুজ্জামান এ প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও শাফিঈ (র.)-এর মতে উযুর মধ্যে **موالات** আবশ্যক নয়। ইমাম বুখারী (র.)-এর মতামতও তাই।(تيسير الباري– ج1 ص92)

পক্ষান্তরে গায়র মুকাল্লিদগণের নিকট উযুর মধ্যে **موالات** আবশ্যক। তা পরিত্যাগ করা বিদআত। যেমন এ প্রসঙ্গে সিদ্দীক হাসান খান সাহেব বলেন- উযুতে **موالات** পরিত্যাগ করা বিদআত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উযু এবং তাঁর উযুর বর্ণনাকারীগণের কারো পক্ষ হতে কখনো এমন বর্ণনা সাবিত নেই যে, তিনি উযুর এক অঙ্গ ধৌত করার পর অন্য অঙ্গ ধৌত করতে দেরি করেছেন বা দুই অঙ্গ ধৌত করার মধ্যখানে অন্য কোন কাজ করেছেন। সুতরাং এরূপ করা বিদআত থেকে মুক্ত নয়। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আমল দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ সাহাবীর কাজ দলীল নয়, যদিও তা সহীহ এর স্তরে পৌঁছে যায়। (بدور الاهلة– ص28)

পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে, ইমাম বুখারী (র.) যে মাসআলার পক্ষে অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন, ইবনে উমর (রা.) যে আমল করেছেন, এমনকি খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মারফূ হাদীস যার পক্ষে বিদ্যমান, গায়র মুকাল্লিদ এক আলিমের নিকট তা বিদআত। তাহলে কি সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.) এবং সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জনে বিদআত করলেন? (العياذ بالله)

পাঠকবৃন্দ আরও চিন্তা করুন, সিদ্দীক হাসান সাহেবের নিজস্ব অভিমত হলো, সাহাবায়ে কিরামের কাজ সহীহ সনদে বর্ণিত হলেও তা দলীল হতে পারে না।

৬ষ্ঠ মাসআলা

মহিলাদের স্পর্শ করার দ্বারা উযু ভঙ্গ হয় না

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মহিলাদের স্পর্শ করার দ্বারা উযু ভঙ্গ হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আয়শা (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণের নিকট মহিলাদেরকে স্পর্শ করার মাধ্যমে উযু ভঙ্গ হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে আহলে হাদীস, ১ম খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

৭ম মাসআলা

ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায পড়া জায়িয নয়

ইমাম বুখারী (র.) ফজর ও আসরের পর নামায পড়া সম্পর্কে কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (بخاري– ج1 ص82)

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই প্রকারের বেচাকেনা, দুই প্রকার পোশাক ও দুইটি নামায থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ– (بخاري– ج1 ص82)

অর্থাৎ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ফজরের নামাযের পর সূর্য উপরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ– (بخاري– ج1 ص83)

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'সময় নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

বুখারী শরীফের উপরোক্ত তিন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ। অথচ গায়র মুকাল্লিদীণগণের নিকট কোন কোন নামায যেমন তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাওয়াফের নামায এবং ফজরের সুন্নাত পড়া জায়িয। এ প্রসেঙ্গ নওয়াব নুরুল হাসান খান লেখেন- 'ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত কোন নামায পড়া বৈধ নয় তবে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত পড়া যাবে। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যস্ত কোন নামায জায়িয নয়, তবে তাওয়াফের দু'রাকাআত নামায পড়া জায়িয। তাওয়াফের নামায দিন রাত্রির যে কোন মুহূর্তে পড়া জায়িয। (عرف الجاوي– ص14)

৮ম মাসআলা

জুম'আর সময় সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর শুরু হয়

বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (র.) একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেন-

بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

উক্ত অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

অর্থাৎ হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য হেলে যাওয়ার পর জুম'আর নামায পড়তেন। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন-

جَزَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهَا لِضَعْفِ دَلِيل الْمُخَالِف عِنْده. – (فتح الباري– ج2– ص387)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.) এই মাসআলাটি দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন, যদিও তাতে ভিন্নমত রয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে ভিন্নমত পোষণকারীদের মত দুর্বল। (ফতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩৮৭ পৃষ্ঠা)।

নওয়াব ওহীদুজ্জামান বলেন- ইমাম বুখারী (র.) ঐ মত গ্রহণ করেছেন যে, সূর্য হেলে যাওয়ার পর জুম'আর সময় শুরু হয়। কারণ তা যুহরের স্থলাভিষিক্ত। (তাইসিরুল বারী, ২য় খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

অপরদিকে গায়র মুকাল্লিদীনগণের অভিমত হল- **زوال** তথা সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বেই জুমআ আদায় করা জায়িয। যেমন- নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, এমন হাদীস রয়েছে যার থেকে প্রমাণিত হয় যে জুমআ **زوال** এর পূর্বে আদায় করা জায়িয। (**الروضة الندية– ج 1 ص 137**) অন্যত্র তিনি এ অভিমতকেই সঠিক বলে মন্তব্য করেন।

নওয়াব নুরুল হাসান সাহেব লেখেন : জুমআর সময় আর যুহরের সময় একই। তবে জুমআ যাওয়াল এর পূর্বেও আদায় করা জায়িয। (**النهج المقبول في شرائع الوسول– ص 28**)

নওয়াব ওহীদুজ্জামান বলেন-

وقتها من حين ارتفاع الشمس قدر رمح الي انتهاء الظهر– (نزل الابرار– ج1 ص 152)

জুমআর সময় হলো সূর্য তীর বরাবর উপরে উঠার পর থেকে যুহরের শেষ সময় পর্যন্ত।

৯ম মাসআলা

জুমআর দুই আযান সুন্নত

ইমাম বুখারী (র.) একটি অধ্যায় রচনা করেন- **بَاب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ** খুতবার সময়কার আযান এর অধ্যায়। উক্ত অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেন-

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

অর্থাৎ যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সাইব বিন ইয়াযীদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, এর পর আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে জুমআর দিনে আযান হত যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে বসতেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন লোক বৃদ্ধি

পেলো, তখন তিনি জুমআর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী যাওরায় আযান দেয়া হয়। এরপর থেকেই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)।

বুখারী শরীফে উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুমআর দিনে তৃতীয় আযান সাহাবায়ে কিরামের সময় থেকেই প্রচলিত (এখানে তিনটি আযান বলতে দুটি আযান ও একটি ইকামত উদ্দেশ্য)। উসমান (রা.)-এর নির্দেশে তা প্রচলিত হয় কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং সকল সাহাবীর ইজমার মাধ্যমে তা বিধিবদ্ধ। পরবর্তীকালে কোন ইমাম ফকীহ, মুজতাহিদগণের কেউই এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি। সুতরাং ইহা সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরামের সুন্নতের উপর আমল করা উম্মতের জন্য আবশ্যক। প্রথমে ঐ আযান زوراء -এ দেয়া হত। এরপর মসজিদের ভেতর দেয়া আরম্ভ হয়। এরই প্রেক্ষিতে হারামাইন শরীফাইনসহ সকল মসজিদেই জুমআর আযান মসজিদের ভেতর দেয়া হয়।

অন্যদিকে হাদীসে সাহাবী, ইজমায়ে উম্মত ও উম্মতের আমল সত্ত্বেও গায়র মুকাল্লিদগণ জুমআর এ আযানকে বিদআত আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাদের মতে ঐ আযান যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ছিল না এজন্য তা সুন্নত হতে পারে না। সুতরাং তারা আযান দেনও না এবং মসজিদে এরূপ আযান দেয়া বিদআত বলে থাকেন।

গায়র মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব লেখেন- ‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর প্রথম দু’খলীফার সময়ে এরূপ আযানের প্রচলন ছিল না। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে তা আবিস্কৃত হয়। যা সময় পরিচয়ের জন্য যাওরা বাজারের উঁচু জায়গাতে দেয়া হত, মসজিদে দেয়া হত না। সুতরাং আমাদের সময়ে মসজিদে যে দুটি আযান দেয়া হয় তা স্পষ্ট বিদআত এবং কোন অবস্থাতেই তা জায়িয নয়। (فتاوي ستارية–ج 3 ص85)

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের মতে, জুমআর নামাযের জন্য মসজিদের ভেতর একটি আযান সাব্যস্থ আছে। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় দ্বিতীয় আযান মসজিদে বাইরে প্রচলিত হয়। সুতরাং এক আযানের উপর সংক্ষিপ্ত করা উচিত। দ্বিতীয় আযান না দেয়া উচিত। (প্রাগুক্ত)

মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব বলেন- এখন মসজিদে দু’ আযান দেয়া বিদআত। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৮৭)

গায়র মুকাল্লিদগণের তরজমানে রিসালাহ الاعتصام এর ফতওয়া নিম্নরূপ:

জুমআর দিন খুতবার সময় এক আযান দেয়া বিধিসম্মত। দ্বিতীয় আযানের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আযানে উসমানী যাকে প্রথম আযান বলা হয় তা মসজিদের ভেতর দেয়া বিদআত। (فتاوي علماء حديث– ج 2 ص179)

গুরাবায়ে আহলে হাদীস জামাতের ইমাম আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের শিষ্য আবূ মুহাম্মদ মিয়া নুওয়ালী বলেন : হানাফী ও আহলে হাদীসদের মসজিদসমূহে দুই আযান দেয়া হতো, যেমন আজকাল হানাফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মাওলানা আব্দুল ওহাব সাহেব প্রথম আযানকে; যা খুতবা প্রদানের আধঘন্টা পূর্বে মসজিদের ভেতর হয়ে থাকে তাকে নির্ভরযোগ্য প্রমানাদি দ্বারা বিদআত সাব্যস্থ করে ফতওয়া প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় আযান যা ইমাম সাহেব মিম্বরে বসার পর দেয়া হয় তা সঠিক বলে ফতওয়া প্রদান করেন। যার ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ আহলে হাদীসদের মসজিদে তরীকায়ে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আমল হচ্ছে।

নওয়াব ওহীদুজ্জামান বলেন- এই সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে হাদীস ছাড়া আর কারও মধ্যে প্রচলিত নেই। যেদিকেই তাকান দেখবে সুন্নতে উসমানীর প্রচলন।

ড. শফিকুর রহমান লেখেন- মসজিদের ভেতর ইমাম সাহেবের খুতবা প্রদানের আগে কেবল একটি আযানই আইনসিদ্ধ। এর পূর্বে যে আযান দেয়া হয় তা উসমান (রা.)-এর সময়কালেও প্রচলিত হয়নি। সুতরাং তা বর্জন করা উচিত।

১০ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে সফরের দূরত্ব হচ্ছে ৪৮ মাইল

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে উল্লেখ করেন:

بَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا.

অর্থাৎ এ অধ্যায় হচ্ছে কতটুকু পথ অতিক্রম করলে নামায কসর পড়া যাবে, সে প্রসঙ্গে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এক রাতের ভ্রমনকে সফর বলেছেন। হযরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) ৪ বরীদ পথ অতিক্রম করলে নামায কসর করতেন, রোযা ভঙ্গ করতেন। ৪ বরীদ হল ১৬ ফসরখ দূরত্ব।

যেহেতু ১ ফরসখ হচ্ছে ৩ মাইলের সমপরিমান। সুতরাং ইমাম বুখারী (র.) এর আনীত অধ্যায় থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সফরের দূরত্ব হলো ৪৮ মাইল। কিন্তু

গায়র মুকাল্লিদগণ এ ফতওয়ায় ইমাম বুখারী (র.)-কে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের নিজস্ব মতানুযায়ী কেউ নয় মাইল, আবার কেউ তিন মাইলকে সফরের দূরত্ব বলে থাকেন। এমনকি তাদের ইমাম ওহীদুজ্জামানের মতে ''আহলে হাদীসের সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মত হল সফরের কোন নির্ধারিত দূরত্ব নেই। যতটুকু পথ অতিক্রম করলে প্রচলিত অর্থে সফর বলে মনে হবে ততটুকুই সফর।'' (تيسير الباري– ج 2 ص 136)

মাওলানা সানাউল্লাহর মতে, নিজের অঞ্চল হতে বের হয়ে অন্য কোন বস্তিতে গেলেই তাকে মুসাফির বলা হবে। এর নিম্নপরিমাণ হাদীস শরীফে তিন মাইল উল্লেখ আছে। (فتاوي ثناوية– ج 1 ص 630)

গুরাবায়ে আহলে হাদীস জামাতের মুফতী আব্দুস সাত্তার লিখেছেন : তিন মাইল বা ৯ মাইল পথ অতিক্রম করলে নামায কসর পড়বে। (فتاوي ستارية– ج 3 ص 57)

মাওলানা ইসমাঈল সালফীর মতে বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী ৯ মাইল দূরত্বকে সফর বলে। (رسول كريم كي نماز– 3 ص 106)

১১ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মৃত লোক শুনতে পান

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে হাদীস এনেছেন:

بَاب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (البخاري– ج 1 ص 178)

অর্থাৎ আলোচ্য অধ্যায় হচ্ছে মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়াজও শুনতে পায় এ প্রসঙ্গে। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন মৃতকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী-সাথীরা পেছন ফিরে চলে যায়; সে ঐ লোকদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, এমন সময় দু'জন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বসান এবং বলেন (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখিয়ে) এই লোককে তুমি কি বলতে?

এ অধ্যায় ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর দৃষ্টিতে মৃত লোকেরা শুনতে পান। কিন্তু বর্তমান যুগের গায়র মুকাল্লিদীনগণ এই মাসআলার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাদের পূর্বসূরী আহলে হাদীসের ইমাম মাওলানা ওহীদুজ্জামান বলেন, سماع موتي বিষয়ক মাসআলা কবরের শাস্তি বা রূহ এর হাকীকতের মতো কোন তাহকীকী মাসআলা নয়। বরং এটি শিরকের সবচেয়ে বড় চোর দরজা। কারণ মৃতদের শোনার যে কোন ধরণের সম্ভাবনা পবিত্র কুরআন সর্বশক্তি দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। (تيسير الباري– ج 2 ص 295)

গায়র মুকাল্লিদগণের আরেক আলিম প্রফেসর আব্দুল্লাহ এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন- 'আরে ভাই, এটা কি কোন মাসআলা হলো? এটা তো দেখার বিষয়। আপনি যদি কোন মৃতকে কথা বলতে দেখেন, তাহলে বুঝে নিতে পারবেন সে শুনতে পায় কি না? যে শুনবে সে আবার মৃত হয় কিভাবে? কারণ শুনা তো জীবিত লোকের কাজ, মৃতের নয়। যে মারা যায় সে এ জগত থেকে বরযখের জগতে চলে যায়। দুনিয়ার ই'তিবারে সে মৃত। সে না শুনতে পায়, না কথা বলতে পারে। (الروح– عذاب قبر اور سماع موتي– ص 46)

১২ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে ইহরাম অবস্থায় আকদে নিকাহ জায়িয

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে ইহরাম অবস্থায় আকদে নিকাহ জায়িয। দলীল হিসাবে বুখারী শরীফের হাদীস ও অধ্যায় -

بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ– (بخاري– ج 1 ص248)

অর্থাৎ মুহরিমের বিবাহ অধ্যায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়মুনাহ (রা.)-কে বিয়ে করেন, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

অন্যত্র ইমাম বুখারী (র.) অধ্যায় এনেছেন-

بابٌ نِكاحِ المحُرِمِ – أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ– (بخاري– ج 1 ص766)

অর্থাৎ মুহরিমের বিবাহ অধ্যায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেন। (বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৭৬৬ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত দুই হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) ইহরাম অবস্থায় আকদে নিকাহ জায়িয হওয়ার পক্ষে মত পোষন করতেন। কারণ উক্ত হাদীস বর্ণনা করে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন-

كَأَنَّهُ يَحْتَجّ إِلَى الْجَوَاز ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِي الْبَاب شَيْئًا غَيْر حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُخَرِّج حَدِيث الْمَنْع كَأَنَّهُ لَمْ يَصِحّ عِنْده عَلَى شَرْطِهِ. (فتح الباري– ج 9 ص 165)

অর্থাৎ যেন তিনি উক্ত হাদীস দ্বারা (ইহরাম অবস্থায় বিবাহ) জায়িয হওয়ার দলীল দিচ্ছেন। কারণ এ অধ্যায়ে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করেননি এবং নিষেধের হাদীসও উল্লেখ করেননি। হয়তো তা তাঁর শর্ত মুতাবিক সহীহ নয়।

আল্লামা ওহীদুজ্জামান বলেন, যেমনত: এই মাসআলায় ইমাম বুখারী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আহলে কূফার মতামতের সাথে একমত যে, মুহরিম কর্তৃক আকদে নিকাহ জায়িয। (تيسير الباري– ج 3 ص42)

কিন্তু এ স্পষ্ট হাদীস ও ইমাম বুখারী (র.) এর অভিমতের বিপরীত গায়র মুকাল্লিদগণের মতে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে নিষিদ্ধ। তাদের বড় আলিম মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন-

وهو قول الجمهور والراجح عندي– (تحفة الاحوذي– ج 2 ص 88)

অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়াই জমহুরের মত এবং আমার নিকট এটাই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ও মাওলানা শামসুল হকও অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। (السراج الوهاج– ج 2)

১৩ নং মাসআলা

হযরত আয়শা (রা.)-এর নিকাহ ও রুখসতী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.)-এর নকলকৃত হাদীস ও গায়র মুকাল্লিদদের অভিমত

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র.) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন, যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হযরত আয়শা (রা.)-এর নিকাহ হয় ছয় বছর বয়সে এবং রুখসতী হয় নয় বছর বয়সে হয়েছিল। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ. (بخاري– ج 1 ص 551)

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন তখন আমি ছয় বছরের মেয়ে। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা)।

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ– (بخاري– ج ص 551)

অর্থাৎ হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের ৩ বছর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় নিকাহ ছাড়া অবস্থান করেন। হযরত আয়শা (রা.)-কে নিকাহ করেন তখন তিনি ৬ বছরের মেয়ে। আর যখন রুখসতী করেন তখন তিনি ৯ বছরের মেয়ে। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ এ বর্ণনাকে মাওযূ বলেন। এ বিষয়ে তাদের মুহাক্কিক ফয়জে আলম সিদ্দীকী এর মন্তব্য নিম্নরূপ: ''একদিকে বুখারী শরীফের ৯ বছর সম্পর্কিত হাদীস আর অন্যদিকে এত শক্ত প্রমানাদি ও বাস্তবতা, যা থেকে পরিস্কার দৃশ্যমান হয় যে, ৯ বছর সম্পর্কিত বর্ণনা موضوع (বানোয়াট) যা আমি সাহাবীর প্রতি সম্পর্কিত ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। আর সাহাবীর প্রতি সম্পর্কিত একটি বর্ণনা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আজ যখন ভাল ভাল জ্ঞান ও মর্যাদার দাবিদার লোকের সামনে সহীহ স্পষ্ট বর্ণনা পেশ করা হয় তখন তারা জবাবে বলেন তোমরা অবাস্তব অনুভূতির শিকার।''

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, নিজেদের মতামতের বিপরীত হবার কারণে লা-মাযহাবী

ফয়যে আলম সিদ্দীকী বুখারী শরীফের হাদীসকে মাওযূ তথা বানোয়াট বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তারাই নাকি আবার সর্বক্ষেত্রে দলীল হিসেবে বুখারী শরীফের হাদীস দাবি করেন?

১৪ নং মাসআলা

ইফকের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ২য় খণ্ড ৫৯৩ পৃষ্ঠায় **بَاب حَدِيثِ الْإِفْكِ** শীর্ষক অধ্যায়ে এবং ৬৯৬ পৃষ্ঠায় **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ** আয়াতের তাফসীরে হযরত আয়শা (রা.)-এর উপর প্রদত্ত অপবাদ সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। অধিক লম্বা হাদীস হওয়ায় এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। হযরত আয়শা (রা.)-এর এ ঘটনা বুখারী শরীফ ছাড়াও প্রায় সকল তাফসীর ও হাদীসের কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণের নযীর বিহীন বিশ্লেষক হাকীম ফয়যে আলম এর বিপরীতে বলেন যে এ ঘটনা কোন অবস্থাতেই হযরত আয়শা (রা.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। যদিও এ ঘটনা সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক নিজেদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন তথাপি হাকীম সাহেব তাদের সকলের বিপরীতে বিশেষ করে ইমাম বুখারী (র.)-এর বিপরীতে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় হাকীম সাহেব লিখেছেন যে মুহাদ্দিসগণ, হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ এবং ইতিহাস রচয়িতাদের তাকলীদী মন মানসিকতা দেখে নাকি তার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

ইমাম বুখারী (র.) ইফকের ঘটনা সম্পর্কিত যে হাদীসসমূহ বুখারী শরীফে উল্লেখ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (র.)-এর অনুসরণ করাকেও তিনি উলামায়ে কিরামের ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাকীম ফয়যে আলম লেখেন- ‘‘ঐ মুহাদ্দিসগণ, ঐ ব্যাখ্যাকারগণ, সীরাত লেখক এবং ঐ মুফাসসিরগণের অনুসরনপ্রবণতার উপর কাঁদতে ইচ্ছে হয়, যারা এধরণের কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে অক্ষম। এ ঘটনা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এ ধর্মীয় ও বিশ্লেষণমূলক দক্ষতার অভাবে হাজারো সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমাদের ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সঠিক এবং সন্দেহাতীত। চাই তা আল্লাহ তা’আলার উপাস্য হওয়ার বিষয় হোক, কিংবা নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় হোক, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের পবিত্রতার বিষয়গুলো কালিমালিপ্ত করে হোক। এটা কি ইমাম বুখারীর সেই একই ধরনের অন্ধ অনুকরণ নয়, যেমনিভাবে

মুকাল্লিদগণ চার ইমামের অনুসরণ করে থাকেন। (সিদ্দিকায়ে কায়েনাত, পৃষ্ঠা-১০৬)

এখানে হাকীম ফয়যে আলম একই সাথে ইমাম বুখারী (র.) সহ সকল উলামা-মুহাদ্দিসীনকে দোষারোপ করেছেন। এমনকি তিনি ইমাম বুখারী (র.) কে হযরত আয়িশা (রা.)-এর উপর কালিমা লেপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.)-এর প্রতিও তাদের কোনো আস্থা নেই।

১৫ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে একই মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র.) অধ্যায় এনেছেন এভাবে:

بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ- (بخاري- ج 2 ص 781)

অর্থাৎ যারা বলেন একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে তারা দলীল প্রদান করেন আল্লাহ তাআলার বাণী 'তালাক দুই বার। এরপর ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখবে অথবা ভালভাবে ছেড়ে দেবে-' এই আয়াত দ্বারা। (বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা)।

এ অধ্যায় থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে, চাই এক সাথে দেয়া হউক বা আলাদা আলাদা। কারণ তিনি কোন শর্তারোপ ছাড়াই তিন বলেছেন। তাঁর মতে যদি কোন পার্থক্য থাকত তাহলে অবশ্যই আলাদা আলাদা অধ্যায় রচনা করতেন। একথার স্বপক্ষে আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন-

وَالَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ كَانَ أَرَادَ بِالتَّرْجَمَةِ مُطْلَق وُجُود الثَّلَاث مُفَرَّقَة كَانَتْ أَوْ مَجْمُوعَة- (فتح الباري- ج 9 ص 365)

আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো তিনি এ অধ্যায় দ্বারা মুতলাক তিন তালাক পতিত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। চাই তা আলাদা আলাদা দেয়া হোক বা এক সাথে। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র.) হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) এর হাদীস বর্ণনা করেন-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ–

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। এর পর ঐ মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় স্বামীও তাঁকে তালাক দিলেন। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হলো, ঐ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'না, যতক্ষণ ঐ স্বামী তাঁর স্বাদ গ্রহণ না করবে যেমনভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছিল।'

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, একই সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়।

ইমাম বুখারী অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেন:

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ... وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ– (بخاري– ج 2 ص 792)

অর্থাৎ আহলে ইলম তথা জ্ঞানীগণ বলেন যখন কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তখন ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায়। ... লাইস বলেন নাফে থেকে, হযরত ইবনে উমর (রা.) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, যদি এক বা দুই তালাক দিতেন (তাহলে প্রত্যাবর্তন করা যেত)। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন- যদি কেউ তিন তালাক দেয় তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করবে।

ইমাম বুখারী (র.) কর্তৃক আহলে ইলমের উক্তি বর্ণনা করা ও হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর মতামত বর্ণনা করা থেকে বুঝা যায় যে এটিই তাঁর অভিমত।

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ এ ক্ষেত্রেও ইমাম বুখারী (র.)-এর মতের বিপরীত মত পোষণ করে ফতওয়া প্রদান করেন। যা তাদের সকল ফতওয়ার কিতাবেই বিদ্যমান আছে।

১৬ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে তিন দিন পর্যন্ত কুরবানী দেয়া যায় এর চেয়ে বেশি নয়

বুখারী শরীফের হাদীস:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ– (بخاري– ج 2 ص 835)

অর্থাৎ হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমাদের যারা কুরবানী দিবে তারা যেন কোন অবস্থাতেই তৃতীয় দিনের পর এমন সকাল না পায় যে, তার ঘরে কুরবানীর কোন কিছু (গোশত) বিদ্যমান আছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ–

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা কুরবানীর গোশতে লবণ লাগিয়ে মদীনা শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে পেশ করতাম। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তিন দিনের বেশি তা খেয়ো না। হযরত আয়শা (রা.) বলেন- এটার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু তিনি চাইতেন যাতে অন্যরা ঐ গোশত হতে খেতে পারে।

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ– (بخاري– ج 2 ص 835)

অর্থাৎ আবূ উবাইদ (র.) বলেন, এরপর আমি হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.)-এর সাথে ঈদ করলাম। তিনি খুতবার পূর্বে নামায আদায় করলেন, এরপর খুতবা দিলেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ

الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ–
(بخاري– ج 2 ص 835)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তিনদিন পর্যন্ত- কুরবানীর গোশত খাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখন মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন কুরবানীর গোশত না খাওয়ার জন্য যয়তুন দিয়ে রুটি খেতেন।

উপরোক্ত চারখানা হাদীস থেকে জানা যায় যে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করে তা খাওয়া যাবে না। সুতরাং তিন দিনের পর কুরবানী করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী (র.) বলেন- আমাদের দলীল হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যেদিন গোশত রাখা জায়িয নয়, সেদিন কুরবানীও জায়িয নয় (আল মুগনী)। কিন্তু আহলে হাদীস নামধারীগণ বুখারী শরীফের উপরোক্ত হাদীসসমূহকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন যে, উক্ত দিনের পর চতুর্থ দিনেও কুরবানী করা জায়িয। শুধু তাই নয়, তারা একে একটি মৃত সুন্নতের পুনর্জীবন দান বলেও বিশ্বাস করেন।

উল্লেখ্য, তিন দিনের বেশি গোশত মজুদ রাখার নিষেধের বিধান পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। তবে তিন দিন পর্যন্ত কুরবানী করার হুকুমটি বাকী আছে।

১৭ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মুসাফাহা দুই হাত দিয়ে করা সুন্নত

ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় কিতাবে مُصَافَحَة সম্পর্কিত অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন بَاب الْمُصَافَحَةِ। এ অধ্যায়ে কেবল মুসাফাহা সুন্নাত এ সংক্রান্ত হাদীস এনে অন্য আরেকটি অধ্যায় এনেছেন এভাবে- بَاب الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ -দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করার অধ্যায়। হাম্মাদ বিন যায়েদ (র.) ইবনুল মুবারক (র.)-এর সাথে দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করেছেন। (বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৯২৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত অধ্যায়ের নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে ইমাম বুখারী (র.) দুই হাতে

মুসাফাহা করাকে সুন্নাত মনে করতেন। তা না হলে তিনি মুসাফাহার অধ্যায় আলোচনার পর আবার দুই হাতে মুসাফাহার আলাদা অধ্যায় প্রণয়ন করতেন না এবং হযরত হাম্মাদ বিন যায়দ ও আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র.)-এর আমলও বর্ণনা করতেন না। ইমাম বুখারী (র.) বলেন- আমার পিতা ইমাম মালিক (র.) হতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ বিন যায়দ ও আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র.) কে দুই হাতে মুসাফাহা করতে দেখেছি।

কিন্ত ইমাম বুখারী (র.)-এর মতামত, সালফে সালেহীনদের আমলের পরিপন্থী গায়র মুকাল্লিদগণের মতে মুসাফাহা এক হাতে হবে। দুই হাতে মুসাফাহা করা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নেই। যেমন- গায়র মুকাল্লিদ হামিদুল্লাহ মিরাটী বলেন- প্রকাশ থাকে যে, মুসাফাহা প্রসঙ্গে যদিও এটা প্রচলিত আছে যে, অধিকাংশ লোক দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করেন এবং এটাকে উত্তম বলে মনে করেন। কিন্তু হাদীস দ্বারা এক হাতে মুসাফাহা করা প্রমাণিত। (ফতওয়ায়ে নযিরিয়া, ৩য় খণ্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা)

একই ফতওয়ায় তিনি আরো বলেন- আরও একটি মাসআলা এই যে, মুসাফাহা এর সুন্নত তরীকা হচ্ছে এক হাতে মুসাফাহা হবে। দুই হাতে মুসাফাহা সুন্নত নয়। এ ফতওয়া মিয়া নযীর হুসাইন সাহেবের সত্যায়নকৃত।

আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও এই মাসআলার সমর্থক। এর সমর্থনে তিনি বলেন, এটিই সঠিক। নিঃসন্দেহে এটিই মুসাফাহার সুন্নত তরীকা যে, এক হাতে অর্থাৎ ডান হাতে মুসাফাহা করবে। দুই হাতে মুসাফাহা করা কোন সহীহ মরফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

১৮ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মুজতাহিদের কিয়াস হচ্ছে শরীআতের দলীল

বুখারী শরীফের হাদীস:

بَاب مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.

অর্থাৎ এ অধ্যায় হচ্ছে একটি জানা বিষয়কে একটি স্পষ্ট মূলনীতির সাথে তুলনা করা যার বিধান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন যাতে প্রশ্নকর্তা বুঝে নিতে পারে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক বেদুইন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে এসে বললেন, আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের ছেলে জন্ম দিয়েছে। এটাকে আমি অস্বীকার করছি। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার কি উট আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোর রং কিরূপ? তিনি জবাবে বললেন, লাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোর মধ্যে কি খাকী রং এর কোন পশু আছে? তিনি বললেন, জি আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, এগুলো কোত্থেকে এসেছে বলে তুমি মনে কর? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কোন একটি রগের কারণে হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার সন্তানের অবস্থাও অনুরূপ হতে পারে যে, কোন রগের কারণে এরূপ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তকে তার সন্তান অস্বীকার করার কোন অনুমতি দেননি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বললেন, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই তিনি মারা যান। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন- হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তুমি কি মনে কর যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর। কারণ তিনি ঋণ পরিশোধের অধিক হকদার।

উপরোল্লেখিত প্রথম হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশুর রং পরিবর্তনের কারণের উপর মানুষের রং পরিবর্তনের কিয়াস করেছেন এবং

দ্বিতীয় হাদীসে বান্দাহর ঋণের উপর আল্লাহর ঋণের কিয়াস করেছেন। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, প্রয়োজনে কিয়াস করা জায়িয।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন এরই নাম কিয়াস। উপরের দুই হাদীস দ্বারা কিয়াসের বৈধতা সাব্যস্থ হয়। তবে সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ফকীহগণের মধ্যে হযরত আমীর, শা'বী ও ইবনে সিরীন (র.) ছাড়া বাকী সকল সাহাবী ও ফকীহগণ কিয়াস জায়িয হওয়ার পক্ষে একমত। জমহুর সাহাবী এবং তাবিঈ থেকে কিয়াস সাব্যস্থ আছে। যখন কুরআন বা হাদীসে সরাসরি কোন মাসআলার সমাধান পাওয়া না যায়, তখন সহীহ শর্ত মোতাবিক গৃহীত কিয়াস জায়িয এবং ইহা ছাড়া কাজ চালানো অসম্ভব। **(تيسير الباري– ج 9 ص 339)**

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ ইমাম বুখারী (র.)-এর মতের বিপরীত কিয়াসকে নাজায়িয বলে থাকেন। এমনকি তারা এটাকে শয়তানের কাজ বলে থাকেন। তারা বলেন আহলে হাদীসের দুটি মূলনীতি **أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ** তারা হানাফী মতাবলম্বীকে আহলে রায় ও কিয়াস বলে অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন।

নওয়াব নুরুল হাসান খান বলেন- আর যেহেতু ইজমার কোন সুযোগ নেই, সুতরাং প্রচলিত কিয়াস যাকে ফকীহগণ ৪র্থ দলীল বলে আখ্যায়িত করেছেন তারও প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। দীন ইসলাম এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্য মিল্লাতের দলীল দুটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল। ঐ দুই বস্তু ছাড়া আর কিছুই অকাট্য দলীল নয়।
(عرف الجاوي– ص 3)

উপরোল্লিখিত নওয়াব ওহীদুজ্জামান সাহেব 'কিয়াস ছাড়া কাজ চালানো অসম্ভব" এমন মন্তব্য করার পর অন্যত্র ঠিক তার বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন:

وأصول الشرع اثنان– الكتاب والسنة وزاد بعضهم الأجماع مطلقا والقياس الصحيح أيضا– والحَقُّ ان الإجماع الظني والقياس ليستا بحجتين ملزمتين مظهرتان اقناعيتان–
(هدية المهدي– ج 1 ص 82)

অর্থাৎ শরীআতের মূল নীতি দুটি: কিতাব ও সুন্নাহ। কেউ কেউ সর্ব প্রকার ইজমা এবং কিয়াসকে মূলনীতি বলে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হল **اجماع ظني** ও কিয়াস দলীল নয়। বরং এগুলো হল প্রকাশকারী ও আকনায়ী।

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বেশ কিছু নব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে যা তার যুগে ঘটেনি। সাহাবায়ে কিরাম এর পক্ষ থেকে সেগুলোর প্রত্যক্ষ কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। সাহাবায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীসের অপরাপর আহকামের আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে অথবা আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে নব উদ্ভুত সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। আর তখনই তাদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে এর দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম দৃষ্টান্তঃ

কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরসুরীদের মধ্যে ভাই এর উপস্থিতিতে দাদার মীরাসের অধিকার সংক্রান্ত মাসআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পেশ হয়নি; তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবাদের সামনে পেশ হয়েছে। ফলে এর সমাধানে তাদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। হযরত ওমর (রা.) এর সুরাহা করতে চেষ্টা করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন- 'লোকসকল! আমার বাসনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে তিনটি বিষয়ের যদি সমাধান করে যেতেন তবে আমরা তা মেনে নিতাম এবং আমরা আজ এ সমস্যায় পড়তাম না। বিষয় তিনটি হলো- ১. 'কালালা' অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধীকারী পিতা বা সন্তানের কেউ নেই। ২. দাদার মীরাস সংক্রান্ত মাসআলা। ৩. সুদ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়।

মোট কথা, দাদার মীরাসের ব্যাপারে হাদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধান না থাকায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ

হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে একটি নতুন মাসআলা পেশ হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ হল, ইয়ামানের রাজধানী সানআ'তে জনৈকা মহিলার স্বামী তার অন্য পক্ষের একটি সন্তানকে আমানত রেখে কোথাও সফরে যায়। স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে। সৎসন্তানের কারণে অপমানিত হতে হয় কিনা সে ভয়ে মহিলাটি তার অবৈধ প্রেমিককে প্ররোচিত করে তার এক দাস ও অন্য আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে ছেলেটিকে হত্যা করে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে

চামড়ার থলেতে করে একটি পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে সকলেই অপরাধ স্বীকার করে। অত্র এলাকার প্রশাসক ব্যাপারটি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে লিখে পাঠালেন। হযরত ওমর (রা.) তাদের সকলকেই হত্যা করার নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরোও বললেন সানআ-বাসীদের সকলেও যদি তার হত্যায় অংশ গ্রহণ করত আমি অবশ্যই তাদের সকলকে এর কিসাসে হত্যা করতাম।

এ সিদ্ধান্তে হযরত আলী, মুগীরাহ ইবনে শু'বা ও ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে একমত ছিলেন।

অপর পক্ষে ইবনুয যুবায়রের সিদ্ধান্ত ছিল- দিয়াত নেয়া। পরবর্তীতে ইমাম যুহরী, ইবনে সীরীন, রাবিয়াতুর রায়, দাউদ, ইবনুল মুনযিরের মতও তাই ছিল। ইমাম আহমদ থেকে অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে।

তাঁদের মতভিন্নতার কারণ হল, একাধিক ব্যক্তি মিলে কাউকে হত্যা করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি। ফলে এর কোন সমাধান প্রত্যক্ষভাবে কুরআন বা হাদীসে নেই।

১৯ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে ইজমা হচ্ছে দলীল

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় এনেছেন-

بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ– الخ

অর্থাৎ আলোচ্য অধ্যায় হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে ইলমের ঐক্যমত হওয়া সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের আলিমগণের ইজমা সম্পর্কে। (বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ১০৮৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত অধ্যায়ের নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে ইজমায়ে উম্মত শরীআতের দলীল।

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণের নিকট ইজমা শরীআতের দলীল নয়। যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান বলেন : ইজমা সংঘটিত হওয়া, ইজমার ইলম হওয়া এবং আমাদের কাছে তা স্থানান্তরিত হওয়ার মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আসল কথা হল এগুলোর কোনটিই সম্ভব

নয়। এগুলোর সব কটিকে মেনে নেয়া হলেও প্রশ্ন থাকে ইজমা শরীআতের দলীল কি না? অধিকাংশের মাযহাব হল ইজমা দলীল এবং এতদসংক্রান্ত বেশির ভাগ প্রমাণাদি নকলী, আকলী নয়। আসল কথা হল ইজমা দলীল নয়। আর যদি আমরা মেনে নেই যে, ইজমা দলীল, এর ইলম সম্ভব, তা হলে বেশ থেকে বেশ এমন হবে যে, যার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে তা সঠিক। কিন্তু এর উপর আমল করা ওয়াজিব হবে না। (افادة الشيوخ– ص 1121)

এ কারণেই গায়র মুকাল্লিদগণ ইজমা সংঘটিত মাসআলাসমূহের উপর আমল করার ধার ধারে না। তাদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ কেবল আমাদের নয়। তাদের বড় বড় আলিমদেরও অনুরূপ অভিযোগ। যেমন নওয়াব ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন : গায়র মুকাল্লিদগণ যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে থাকেন তারা এত বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন যে, ইজমাঈ মাসআলাসমূহেরও ধার ধারেন না। সালফে সালিহীন, তাবিঈ এমনকি সাহাবীদের ইজমাও মানেন না। কুরআনুল কারীমের তাফসীর কেবল অভিধান দিয়ে তাদের মনগড়া করে থাকেন। হাদীস শরীফে যে ব্যাখ্যা এসেছে তাও শুনেন না। কিছু কিছু সাধারণ আহলে হাদীসের অবস্থা হলো এই যে, তারা কেবল رفع يدين এবং উচ্চস্বরে আমীন বলাকে আহলে হাদীস হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। অন্যান্য আদাব, সুন্নাত ও আখলাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন প্রয়োজন তাদের নেই। গীবত করা, মিথ্যা বলা, অপবাদ দেয়া থেকে তারা বিরত থাকেন না। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ওলী আল্লাহ ও সুফীয়ায়ে কিরামের শানে বেআদবী ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে থাকেন। নিজেদের ছাড়া অন্যান্য সকল মুসলমানকে মুশরিক ও কাফির মনে করেন। কথায় কথায় সকলকে মুশরিক ও কবরপুজারী আখ্যা দিয়ে থাকেন। (لغات الحديث ج 2 ص 91)

২০ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.) আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের কবর থেকে বরকত লাভের পক্ষে ছিলেন

ইমাম বুখারী (র.) বলেন-

وصنفت كتاب التاريخ اذ ذاك عند قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم في الليالي المقمرة– (سير اعلام النبلاء– ج 2 ص 400)

অর্থাৎ আমি كتاب التاريخ গ্রন্থখানা চাঁদনী রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাওদ্বায়ে আতহারের পাশে বসে রচনা করেছি।
তাছাড়া তিনি তাঁর অমূল্য সংকলন জামে বুখারী শরীফের تراجم ابواب বিন্যস্ত করেছিলেন রাওদ্বায়ে আতহার ও মিম্বর শরীফের মধ্যখানে বসে। যেমন-

روي ابن عدي عن جماعة من المشائخ ان البخاري حوَّل تراجم جامعه بين قير النبي صلي الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعيتين– (هدي الساري– صـ489)

অর্থাৎ ইবনে আদী একদল মাশায়িখ থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় جامع গ্রন্থের অধ্যায় সমূহ রাওদ্বা শরীফ ও মিম্বরের মধ্যখানে বসে বিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি অধ্যায় নির্বাচনের পূর্বে তিনি দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন। (**هدي الساري– صـ489**)
অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ কবর থেকে বরকত হাসিলকে শিরক মনে করেন।

২১ নং মাসআলা
ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে
কেবল সঙ্গমের কারণে গোসল আবশ্যক হয় না

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠায় বীর্যপাত ছাড়া কেবল সঙ্গমের কারণে গোসল আবশ্যক হয় কি না? এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস উল্লেখ করে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে- **قَالَ أَبُو عَبْد الله الْغَسْلُ أَحْوَطُ**
অর্থাৎ আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন- গোসল করা অধিক সতর্কতামূলক কাজ।
এর অর্থ হল- হযরত ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে সঙ্গমের দ্বারা গোসল ফরয হয় না, তবে গোসল করে নেয়ার মধ্যে সতর্কতা রয়েছে।
অধিকন্তু ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন-

ههنا مذهب اخر ذهب اليه طائفة من الصحابة واختاره بعض اصحابنا كالامام البخاري وهو انه لا يجب الغسل بالايلاج فقط اذا لم ينزل عملا بحديث انما الماء من الماء.

অর্থাৎ ইহা আরেকটি মাযহাব যার দিকে গেছেন সাহাবায়ে কিরামের এক দল

আর আমাদের কিছু লোক। যেমন- ইমাম বুখারী (র.)। আর তা হল বীর্যপাত না হলে কেবল সহবাসের দ্বারা গোসল আবশ্যক হয় না। ইহা انما الماء من الماء (পানির কারণে পানি ব্যবহার করতে হবে) হাদীসের আলোকে।

কিন্তু ইমাম বুখারী (র.)-এর মতামতের বিপরীত গায়র মুকাল্লিদগণ বলে থাকেন- সহবাস করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। যেমন নওয়াব নূরুল হাসান লেখেন-

وجوب غسل بخروج منی از شہوت است۔ اگرچہ بتفکر باشد۔ وبملاقات ہردوختان اگرچہ انزال نہ شود۔

অর্থাৎ কেবল চিন্তার কারণে বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ দু'লজ্জাস্থানের মিলনের কারণে গোসল ফরয হবে, বীর্যপাত হোক বা না হোক। (عرف الجاوي– ص 14)

হাকীম সাদিক শিয়ালকোটি (লা-মাযহাবীদের একজন বিশিষ্ট আলিম) লেখেন- কেবল সঙ্গমের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ উভয়ে অপবিত্র হয়ে যাবে। তাদের উপর গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত শর্ত নয়। (صلوة الرسول পৃষ্ঠা-৬৩)

২২ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে হায়েযওয়ালী ও গোসল আবশ্যক এমন লোকের কুরআন তিলাওয়াত জায়িয আছে

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন এভাবে- بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ অর্থাৎ 'হায়েযওয়ালী মহিলা কেবল কা'বা শরীফ তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্য সকল কাজ করতে পারবে।' তিনি এ অধ্যায়ে অনেক হাদীস এনে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, গোসল আবশ্যক এমন লোক এবং হায়েযওয়ালী মহিলার জন্য কুরআন তিলাওয়াত জায়িয আছে।

অনুরূপ ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন- ''ইমাম বুখারীর মাযহাব এটি বলে মনে হচ্ছে যে, অপবিত্র ও হায়েযওয়ালী মহিলার জন্য কুরআন তিলাওয়াত জায়িয।'' (تيسير الباري ১ম খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ এর বিপরীতে বলে থাকেন যে, অপবিত্র ও হায়েযওয়ালী মহিলার জন্য কুরআন তিলাওয়াত বৈধ নয়। যেমন নওয়াব নূরুল

হাসান লেখেন-

وجنب و حائض رادر امدن بمسجد وخواندن قران حرام است نه حلال- (عرف الجاوي- ص 15)

অর্থ: অপবিত্র ও হায়েযওয়ালী মহিলার মসজিদে আসা এবং কুরআন তিলাওয়াত জায়িয নয়, বরং হারাম।

হাকীম সাদিক শিয়ালকোটি লেখেন- গোসল আবশ্যক এমন লোক মসজিদে প্রবেশ করবে না। তাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। (**صلوة الرسول** পৃষ্ঠা ৬৯)

হাকীম সাহেব 'হায়িয ও নিফাসওয়ালীর কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ' শিরোনামের অধীনে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন :

عن ابن عمر : عن النبي صلى اللهُ عليه و سلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

অর্থাৎ হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হায়িযওয়ালী এবং অপবিত্র লোক কুরআন তিলাওয়াত করবে না। (**صلوة الرسول** পৃষ্ঠা: ৭৪)

মাওলানা মুহিউদ্দীন সাহেব লেখেন- ''অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে যাওয়া জায়িয নয় এবং কুরআন তিলাওয়াতেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'' (ফিকহে মুহাম্মাদীয়া, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

ড. শফীকুর রহমান যয়দীর কাছে প্রফেসর তালিবুর রহমান লেখেন- জানাবত ও হায়িয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন সহীহ হাদীস নেই। বরং এ অবস্থায় তা মাকরূহ হওয়া আবশ্যক। (**نماز نبوي** ৫৮ পৃষ্ঠা)

২৩ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে উটের আস্তাবলে নামায পড়া মাকরূহ ছাড়াই জায়িয

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- **بَاب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ** উক্ত অধ্যায়ের আলোকে মাওলানা ওহীদুজ্জামান লেখেন- ''ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.) উটের আস্তাবলে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাদের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (**تيسير الباري** ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেবের লেখা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে উটের আস্তাবলে নামায পড়া মাকরূহ ছাড়াই জায়িয। অথচ তার নিজের মতামত হলো উটের আস্তাবলে নামায পড়া হারাম। কেবল হারামই নয়, বরং কেউ নামায পড়ে নিলে পুনরায় নামায পড়তে হবে। তিনি লেখেন- ''প্রকৃত কথা হল উটের আস্তাবলে নামায পড়া হারাম। যদি কেউ নামায পড়ে তবে তার নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক।'' (تيسير الباري ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

২৪ নং মাসআলা

মসজিদের মধ্যে মিহরাব ও মিম্বর

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠায় হযরত সালমা বিন আকওয়া' (রা.) এর একটি হাদীস এনেছেন। হাদীস হচ্ছে-

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

অর্থাৎ মসজিদে নববীর দেয়াল ও মিম্বরের মধ্যখানে এত বেশি খালি স্থান ছিল যে একটি ছাগল চলে যেতে পারত।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন- ''হাদীস থেকে এও বের হল যে, মসজিদের ভেতর মিহরাব ও মিম্বর বানানো সুন্নাত নয়। মিহরাব তো একদম না হওয়া চাই। মিম্বরও কাঠ দিয়ে আলাদা রাখা উচিত। আমাদের যুগে এটা এত প্রসার লাভ করেছে যে, সকল মসজিদেই মিহরাব ও মিম্বর ইট-চুনা দিয়ে তৈরী করা হয়। (تيسير الباري ১ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

বুখারী শরীফের হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মসজিদে নববীতে মিহরাব ছিল না। মাওলানা ওহীদুজ্জামানের মতে মিহরাব বানানো সুন্নাতের খিলাফ। মাওলানা আব্দুস সাত্তারের মতে এটা বিদআত। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে লেখেন- ''নিঃসন্দেহে মসজিদসমূহে প্রচলিত মিহরাব তৈরী নাজায়িয ও বিদআত। (ফতওয়ায়ে সাত্তারিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

কিন্তু বুখারী শরীফের হাদীস ও গায়র মুকাল্লিদগণের পূর্বসূরীদের মতামতের বিপরীতে বর্তমান যুগে গায়র মুকাল্লিদগণের সকল মসজিদেই এ বিদআত চালু রয়েছে এবং তাদের সকল মসজিদেই মিম্বরের সাথে মিহরাব রয়েছে।

২৫ নং মাসআলা

গরমকালে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া সুন্নাত

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- بَاب الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ (অতিরিক্ত গরমের সময় যুহরের নামায দেরী করে পড়ার অধ্যায়) উক্ত অধ্যায়ে তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেন। তা হল-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন গরম বেশি হয়, তখন নামায ঠান্ডা করে (দেরীতে) পড়। কারণ অতিরিক্ত গরম জাহান্নামের শ্বাস।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

অর্থাৎ হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুআয্যিন যুহরের আযান দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঠান্ডা কর, ঠান্ডা কর। অথবা বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরো বললেন, অতিরিক্ত গরম জাহান্নামের শ্বাস। সুতরাং যখন অতিরিক্ত গরম হবে তখন তোমরা নামায ঠান্ডা সময়ে পড়। এমনকি আমরা টিলার উপর ছায়া দেখতে পাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন গরম বেশি হয় তখন নামায ঠান্ডা সময়ে (দেরীতে) পড়। কারণ অতিরিক্ত গরম জাহান্নামের শ্বাস।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমরা যুহরের নামায ঠান্ডা সময়ে (দেরীতে) পড়। কারণ অতিরিক্ত গরম জাহান্নামের শ্বাস।

বুখারী শরীফের উপরোক্ত চারটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বেশি গরম হলে যুহরের নামায দেরী করে পড়া উচিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশই দিয়েছেন। কিন্তু উপরোক্ত চারটি হাদীসের বিপরীতে গায়র মুকাল্লিদগণ বলেন- সকল নামাযই প্রথম ওয়াক্তে পড়া উচিত। তাদের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা সানাউল্লাহ লেখেন- ''নামায সর্বাবস্থায় প্রথম সময়ে পড়া উত্তম। (فتاوي ثنائية ১ম খণ্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

হাকীম সাদিক শিয়ালকোটি স্বীয় গ্রন্থ صلوة الرسول এ প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার প্রতি অনেক তাকিদ দিয়ে এক স্থানে লেখেন- ''আমাদের উচিত নামাযের রক্ষণাবেক্ষনের সাথে সাথে এর সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং পূর্ণ চেষ্টা করা যাতে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় হয়। (صلوة الرسول পৃষ্ঠা ১৪৬)

২৬ নং মাসআলা

নামায কাযা হয়ে গেলে তা আদায় করা আবশ্যক

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৮৩ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ (সময় চলে যাওয়ার পর জামাআতের সাথে নামায আদায় করা সম্পর্কিত অধ্যায়) উক্ত অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

অর্থাৎ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, খন্দকের দিন সুর্যাস্তের

পর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এলেন এবং কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন। এর পর বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! সূর্য অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত আমি আসরের নামায পড়িনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আল্লাহর কসম! আমিও আসর পড়িনি। এরপর আমরা 'বুতহান' পর্যন্ত গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জন্য উযু করলেন, আমরাও করলাম। এরপর সুর্য অস্ত যাওয়ার পর তিনি আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর মাগরিবের নামায পড়লেন।

উক্ত হাদীসখানা ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠায় **بَاب قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَالْأُولَى** অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন। একই পৃষ্ঠায় তিনি অন্য একটি অধ্যায় এনেছেন- **بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ** (যে নামাযের কথা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে)। উক্ত অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস এনেছেন-

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي).

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যে নামাযের কথা ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়। এটাই হচ্ছে ঐ নামাযের কাফফারা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- নামায আদায় কর আমাকে স্মরণ করার লক্ষে।

ইমাম বুখারী (র.)-এর আনীত হাদীস থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত: যে নামায কাযা হয়ে যায়- তা হোক জেনে শুনে অথবা ভুলক্রমে অথবা ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে, তা তাঁর যিম্মা থেকে রহিত হয় না এবং তা আদায় করে নেয়া আবশ্যক। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়ার কারণে কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে কাযা হওয়া নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণে তা আদায় করা আবশ্যক। এ থেকে বুঝা যায়, যে নামায ঐ সকল ওযর ছাড়া কাযা হবে তাও আদায় করা জরুরী। কারণ ওযরের কারণে কাযা হয়ে যাওয়া নামায আদায় করা যখন জরুরী তখন বিনা ওযরে জেনে শুনে কাযা নামায আরও উত্তমরূপে জরুরী হবে।

দ্বিতীয়ত: যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায় তবে তারতীব অনুযায়ী তা আদায় করা উচিত। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের নামায কাযা হয়ে গেলে সাহাবীদের নিয়ে তিনি তারতীব অনুযায়ী নামায আদায় করেন। ইমাম বুখারী (র.)-এর আনীত অধ্যায়ের শিরোনামের চাহিদাও তাই।

কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) কর্তৃক উল্লেখিত হাদীসের বিপরীতে গায়র মুকাল্লিদগণ বলে থাকেন- জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা নেই। কেবল তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলেই চলবে।

মাওলানা ইউনুস দেহলবী লেখেন- যে জেনে শুনে নামায ছেড়ে দেয়, এরপর এর কাযা করতে চাইলে তা পারবে না। কারণ এরূপ নামাযের কাযা হাদীস দিয়ে প্রমাণিত নয়। বরং এমন লোকের জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফারই যথেষ্ট। (دستور المفتي ১৪৯ পৃষ্ঠা)

মাওলানা আব্দুল্লাহ রুপড়ি লেখেন- বালিগ হওয়ার পর যদি নামায স্বল্প হয় যা সাচ্ছন্দে আদায় করে নেয়া যায় তাহলে আদায় করে নিবে। আর যদি বেশি সময়ের হয় যে তা আদায় করা কষ্টকর তাহলে এটাই যথেষ্ট। (ফাতওয়ায়ে আহলে হাদীস, ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

গুরাবায়ে আহলে হাদীস জামাতের সাবেক ইমাম মুফতী আব্দুস সাত্তার সাহেব লেখেন- "কিন্তু প্রশ্ন হল নামায কাযা হলো কেন? প্রকৃত কথা হল ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিলে শরীআতে তার কাযা নেই, অন্য কোন পথও নেই। মানুষ ঘুমিয়ে গেলে জাগ্রত হওয়ার পর ইহাই নামাযের সময়, ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার পরই এর সময়, আর বেহুশ হয়ে গেলে হুশ হওয়ার পর সে নামাযের সময়। এরপর কাযা হওয়ার সুরত আর কোথায়? প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক একটি ওযর তৈরী করে নামায ছেড়ে দিলে এর কোন কাযা নেই। উক্ত ব্যক্তির অপরাধ হলো সে কাফির হয়ে গেছে। তাই তাওবাহ করে তাকে মুসলমান হতে হবে। (فتاوي ستارية ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪)

গায়র মুকাল্লিদগণের শায়খুল হাদীস মাওলানা ইসমাঈল সালফী সাহেব নামায ছেড়ে দেয়ার বিভিন্ন সূরত উল্লেখ করে লেখেন- প্রথম সূরত হল কোন ওযর ব্যতিত অবহেলা করে নামায পরিত্যাগ করবে। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করার অন্তর্ভূক্ত। এর কোন কাযা নেই। এটি من ترك الصلاة متعمدا হাদীসের আওতাভুক্ত। খাঁটি তাওবাহ ছাড়া এর কোন প্রতিষেধক নেই। (رسول كريم كي نماز পৃষ্ঠা ১১৫)

২৭ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে ইমাম বসে নামায পড়ালেও মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- بَاب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ (কতটুকু রোগী হলে জামাআতে উপস্থিত হতে হবে)। উক্ত অধ্যায়ে তিনি হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যার মর্ম হল- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালকালীন রোগের সময় তাঁরই নির্দেশে হযরত আবূ বকর (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সুস্থতা অনুভব করলেন। তিনি মসজিদে তাশরীফ নিলে আবূ বকর (রা.) পিছে চলে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে বসে নামায পড়ালেন, কিন্তু আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়েছিলেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ওযরের কারণে ইমাম বসে নামায পড়ালেও মুক্তাদিগণ পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়াই উচিত। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) লেখেন-

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ قَائِمًا خَلْفَ الْقَاعِدِ.

অর্থাৎ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম কোন ব্যক্তি বসে নামায পড়ানো ব্যক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে। (ফতহুল বারী, ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃ.)

এটিই অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ, ইমাম আবূ হানীফা, শাফিঈ ও ইমাম বুখারী (র.)-এর মত।

ইমাম বুখারী (র.) আরেকটি অধ্যায় এনেছেন- بَاب إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ উক্ত অধ্যায়ে তিনি হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত দু'খানা হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদিদেরকে নির্দেশ দেন "যখন ইমাম বসে নামায পড়বেন তখন তোমরাও বসে নামায পড়"। এ দু'খানা হাদীস বাহ্যিক দৃষ্টিতে অধিকাংশের ও ইমাম বুখারী (র.)-এর মতের বিপরীত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জন্য বুখারী (র.) ঐ হাদীসের জবাব স্বীয় উস্তাদ হুমাইদীর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রদান করেছেন। তিনি লেখেন-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, হুমাইদী বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী- إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا এটি তিনি ওফাতকালীন রোগের সময় বলেছিলেন। এরপর তিনি নিজে বসে নামায পড়িয়েছেন, আর লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বসার নির্দেশ দেননি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলসমূহের মধ্যে শেষের আমলকে গ্রহণ করতে হবে। (تيسيرالباري ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় উস্তাদের বক্তব্য উল্লেখ করায় একথা বুঝা যায় যে, যে সকল হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদীগণকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন তা ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মানসূখ। আর ওফাতকালীন রোগের সময়কার হাদীস নাসিখ। সুতরাং এর উপর আমল করতে হবে।

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ না এ হাদীসের উপর আমল করেন, না ইমাম বুখারীর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষন করেন। তাদের মতে সর্বাবস্থায় ইমাম বসে নামায পড়লে মুক্তাদিগণ বসেই নামায পড়বেন।

মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন- "ইমাম আহমদ ও আহলে হাদীসের মাযহাব হল যখন ইমাম বসে নামায পড়বেন তখন মুক্তাদিগণও বসে বসে নামায পড়বেন।'' (تيسير الباري ১ম খণ্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

২৮ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর দৃষ্টিতে ফরয নামাযের শেষের দু'রাকআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়া উচিত

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- بَاب يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ(শেষ দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়বে)। এ অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي

الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ

অর্থাৎ হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'সূরা এবং শেষ দু'রাকআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন।

বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা উভয়ই পড়তে হবে এবং শেষ দু'রাকআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কারণ ইহাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ছিল।

কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ স্পষ্ট এ হাদীসের বিপরীতে বলে থাকেন ফরয নামাযের শেষ দু'রাকআতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে। যেমন, মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন- চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ দু'রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা পড়া জায়িয আছে। (নুযুলুল আবরার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮)

২৯ নং মাসআলা

মাগরিবের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া সুন্নাত নয়

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- **بَاب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ** (মাগরিবের নামাযের পূর্বে নফল পড়ার বর্ণনা)। উক্ত অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাকে আব্দুল্লাহ মুযানী বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা মাগরিবের নামাযের পূর্বে নামায পড়। তৃতীয় বার তিনি বলেন- যে চায় (সে পড়বে), এ আশংকায় যাতে মানুষ এটাকে সুন্নাত মনে না করে।

عَنْ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ.

অর্থাৎ হযরত মারসাদ বিন আব্দুল্লাহ ইয়াযানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি উকবা বিন আমির আল জুহানী (রা.)-এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনাকে আবূ তামীম (রা.)-এর আশ্চর্যজনক কথা শুনাব? তিনি মাগরিবের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়েন। হযরত উকবা জবাব দিলেন-আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এরূপ করতাম। আমি বললাম, তাহলে এখন করছেন না কেন? তিনি বললেন- ব্যস্ততার কারণে।

বুখারী শরীফের উল্লেখিত দু'হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়া সুন্নাত নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ঐ নামাযকে সুন্নাত মনে করে পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন, যা প্রথম হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত প্রথমে সাহাবায়ে কিরাম নফল হিসেবে তা পড়তেন। পরে তা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন, যা দ্বিতীয় হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ থেকেও বুঝা যায় যে, ঐ নামায সুন্নাত নয়, বরং নফল। তা না হলে সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে এটা সূদুরপরাহত যে, পার্থিব ব্যস্ততার কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করে দেবেন।

কিন্তু বুখারী শরীফের এ দু'হাদীসের বিপরীতে গায়র মুকাল্লিদগণের মতে মাগরিবের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়া কেবল সুন্নাতই নয়, বরং যে এটাকে সুন্নাত মনে করে না সে যালিম ও বিদআতী। যেমন- মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী লেখেন-মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাআত সুন্নাত নামায পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ নামায আযান ও ইকামতের মধ্যখানে পড়তে হয়। মাগরিবের আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে দুরূদ শরীফ পড়ে **اللّٰهم رب هذه الدعوة** শেষ পর্যন্ত পড়বে। এরপর সুন্নাত শুরু করা উচিত। মাগরিবের সুন্নাত ফজরের সুন্নাতের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। (**فتاوي علماء حديث** ৪র্থ খণ্ড ২৩২ পৃষ্ঠা)

"দারুল হাদীস রহমানিয়া, দিল্লী" এর শায়খুল হাদীস মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেব লেখেন-"মাগরিবের নামাযের পূর্বে সুন্নাত পড়াকে প্রত্যাখ্যান করলে, কিংবা একে সুন্নাত মনে না করলে ঐ লোক যালিম ও বিদআতী হবে। (**فتاوي علماء حديث** ৪র্থ খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

৩০ নং মাসআলা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা জানাযার সময় ইমাম মৃতের কোমরের সোজা দাঁড়াবেন

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- بَاب أَيْنَ يَقُومُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ (মহিলা ও পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন)। এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার (র.) লেখেন-

وَلِهَذَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّف التَّرْجَمَة مَوْرِد السُّؤَال ، وَأَرَادَ عَدَم التَّفْرِقَة بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة

অর্থাৎ এ জন্যই লেখক প্রশ্নের মাধ্যমে অধ্যায় গঠন করেছেন আর বুঝাতে চেয়েছেন যে এ মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (ফতহুল বারীঃ ৩য় খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেব লেখেন- "ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে ইমাম সাহেব নারী পুরুষ উভয়ের কোমর বরাবর দাঁড়াবেন"। (তাইসীরুল বারীঃ ২য় খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) ও ওহীদুজ্জামান সাহেবের লেখা থেকে বুঝা যায় ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে এ মাসআলায় নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পুরুষ বা মহিলা সকলের জানাযায়ই ইমাম সাহেব মৃতের কোমরের সোজা দাঁড়াবেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.)-এর মতের বিপরীতে গায়র মুকাল্লিদগণের মত হলো- এ মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরুষের জানাযায় ইমাম মাথা বরাবর এবং মহিলার জানাযায় কোমর বরাবর দাঁড়াবেন। মাওলানা ওহীদুজ্জামান লেখেন-"সুন্নাত হল ইমাম সাহেব মহিলার কোমর বরাবর এবং পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবেন। (**فتاوي علماء حديث** ৫ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা)

মাওলানা ওহীদুজ্জামানের উক্ত ফতওয়া গ্রন্থে এক প্রশ্নের জবাবে লেখা হয়েছে- "যদি মৃত পুরুষ হয় তবে ইমাম তার মাথার বিপরীতে দাঁড়াবেন, আর মহিলা হলে তার কোমর বরাবর দাঁড়াবেন।

তিনি আরো লিখেছেন- "মৃত পুরুষ হলে তার মাথার সোজা দাঁড়ানো মুস্তাহাব, আর মহিলা হলে তার কোমরের সোজা দাঁড়ানো সুন্নাত। (**فتاوي علماء حديث** ৫ম খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা)

শেষ কথা :

আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীরা সর্বক্ষেত্রে বুখারী শরীফ থেকে দলীল চান অথচ বুখারী শরীফের বহু হাদীসের বিপরীতে তারা নিজেরাই আমল করে থাকেন, যা পাঠকবৃন্দ ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাদের বুখারী শরীফ থেকে দলীল চাওয়ার দাবিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তারা দাবি করেন যে, তারা সহীহ হাদীস তথা বুখারী শরীফের হাদীস অনুযায়ী আমল করেন (যদিও তাদের এ দাবী সঠিক নয়), অথচ অন্যরা বুখারী শরীফের হাদীসকে গ্রহণ করলে তারা এটাকে 'অন্ধ অনুকরণ' নামে আখ্যায়িত করেন এবং মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, ফুকাহা ও উলামায়ে কিরামকে গালি গালাজ করেন, যদি উক্ত হাদীস তাদের মনগড়া মতের বিপরীত হয়। তাদের এ সকল কাজই স্ববিরোধী। আসল কথা হলো, লা-মাযহাবীরা বিদ্বেষের বশবর্তী এবং অপব্যাখ্যার শিকার হয়ে উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিকহ তথা উসূলে দীনকে অস্বীকার করে একটি ভ্রান্ত পথের আবিষ্কার করে নিয়েছে এবং সেই ভ্রান্ত পথের দিকে মানুষকে আহবান করে তাদের ঈমান-আকীদা ও আমল বিনষ্ট করছে। এদের থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ আকীদা ও আমলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন।